হাসিমারায় হৈচৈ

অঞ্জন কুমার রায়



হাসিমারায় হৈ চৈ

অঞ্জনকুমার রায়

বুলবুল প্রকাশন

৮বি/১, ট্যামার লেন, কোলকাতা-৯

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ১৮-এল, ট্যামার লেন, কোলকাতা-৯

HASIMARAI HAI CHAI

By Anjankumar Roy

প্রথম প্রকাশ ঃ নববর্ষ, ১৩৯৪

প্রচ্ছদ ঃ রাহুল মজুমদার

প্রকাশক
বুলবুল সাহা
৮বি/১, ট্যামার লেন
কোলকাতা-৯

মুদ্রাকর
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কোলকাতা-৬

মূল্য ঃ পনেরো টাকা

আমার আদরের ছোট্ট
শ্রীমান্ অন্তু, টিটো, সান্টু, চিন্টু ও শ্রীমতী মিতু, রিমি এবং
দেবার্পিতা আর ওদের বয়সের সমস্ত শ্রীমান্ শ্রীমতীদের উদ্দেশ্যে

বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চোখে

চেস্টারটন বলেছিলেন, গোয়েন্দা-কাহিনীই হচ্ছে নগর-জীবনের লোকসাহিত্য। তবে, গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারে নগর আর গ্রামাঞ্চলে যেমন-কিছু পার্থক্য এ-কালে চোখে পড়ে না। বয়সের ক্ষেত্রেও সীমারেখা টানা সম্ভব নয়; ছেলে বুড়ো সকলেই গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন। এ-ক্ষেত্রে যে একটা মস্ত চাহিদা রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীমান অঞ্জনকুমার রায়ের এই বই যে সেই চাহিদা সুন্দরভাবে মেটাবে, তাতে সন্দেহ করি না। গোয়েন্দা-কাহিনী রচনায় অঞ্জনকুমারের আগ্রহ অনেক দিনের! ইতিপূর্বে এমন একটিও রহস্য-গল্প তিনি লিখেছেন, যাতে সাহিত্যরসের যোগান ছিল লক্ষণীয়। এ-বইয়েও সেটা আছে। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য-রসের সঙ্গে রহস্য-রসের এই যে মিশ্রণ, পাঠকেরা একে গ্রহণ করবেন।

ভূমিকা লিখে দিলুম। এবার পর্দা উঠুক। পাঠকেরা আনন্দে দুলতে থাকুন সন্দেহের, সাসপেন্সের দোলায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৫ এপ্রিল, ১৯৮৭

আমার কথা

লিখছি বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল ; কিন্তু এতদিন কেবল বড়দের জন্যই রহস্য এবং এ্যাডভেঞ্চারমূলক লেখা লিখেছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। এরই মাঝে ছোটদের জন্য বেশ একটা জমজমাট লেখা লিখবার পরিকল্পনা অবশ্যই ছিল এবং লিখেও রেখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে।

জানি না লেখার কাজে কতটা সফল হতে পেরেছি। তবে বুলবুল প্রকাশনের উপযুক্ত কর্ণধার শ্রীবুলবুল সাহার ক্রমাগত উৎসাহ এবং আগ্রহের ফলেই বই আকারে দেখা দিল বাক্সবন্দী সেই পাণ্ডুলিপি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আমার পিতা শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা স্বীকার করতেই হয়। সব শেষে খ্যাতিমান কবি ও 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁর প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও আমার এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করলেন তার উল্লেখ না করেই পারছি না।

গল্প কদ্দুর পরিকল্পনা মাফিক হল সে বিচারের ভার তাদেরই ওপর যাদের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলাম আমার এই দীর্ঘ আন্তরিক প্রচেষ্টা।

অঞ্জনকুমার রায়

পি ২, এল. আই. সি. টাউনসিপ
পোঃ মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা



সময়টা নভেম্বরের শেষাশেষি। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার পালা শেষ হয়েছে সবে। কাজেই খুব ভোরে উঠে পড়ার বই খুলে বসা এবং যখন তখন বাবার বকুনি খাওয়া থেকে রেহাই পাওয়া গেছে অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্য। বিছানায় শুয়েই দেওয়াল ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনল নিতাই। সাতটা বাজে এখন। রোদ উঠেছে বাইরে; ঘুলঘুলি ভেদ করে গোলমত একফালি সূর্যকিরণ এসে ঠিকরে পড়েছে পড়ার টেবিলের বইগুলোতে। হাই তুলল নিতাই। বেজায় ঠাণ্ডা বাইরে। লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না কিছুতেই। মা'র গলা কানে এল এবার; রাঁধুনে বামুন ভজুয়াকে কি সব যেন বলছেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ভজুয়ার জবাব অবশ্য খুব পরিষ্কার ভাবেই শুনল নিতাই। বলছিল ভজুয়া—"হা মা, হামি তো তাড়াতাড়ি কোরবে, লেকিন বাজার ভি জলদি হোবে তব্ তো···" হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিতাই-এর; তাইতো! আজ তো ভজুয়ার বদলে বাবাই গিয়েছেন বাজারে! আজই তো আসছেন নকুড় মামা!

তড়াক করে লেপ সরিয়ে উঠে বসল নিতাই; সোয়েটারটা কোনমতে পরে নিয়েই ছুটলো কলতলায়। অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছে বুকের একেবারে ভেতরটায়। ইস্! কী মজাই না হবে নকুড় মামা এলে!

খুব ভালো লাগে নকুড় মামাকে। যখনই আসেন, কতকিছু নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। শেষ এসেছিলেন বছর দুই আগে।

তখন ক্লাশ সিক্সে পড়ত নিতাই। মনে আছে পরিষ্কার, একটা বড় এয়ার-গান, কয়েক বাক্স চকোলেট, এ্যাত্তগুলো গল্পের বই আর একটা ফুটবল নিয়ে এসেছিলেন নকুড় মামা।

মার কাছে নিতাই শুনেছে, ভূটানের কাছাকাছি হাসিমারা নামে একটা জায়গায় কি একটা নাকি চায়ের বাগানে কাজ করেন নকুড় মামা। ভীষণ কাজের চাপ ওখানে—ছুটি পাওয়া যায় না মোটে। এবারে নাকি আসছেন অফিসের কাজ নিয়েই। দুদিন পরই ফিরে যাবেন আবার। তারপর অবশ্য দিন ১০।১২ পর আবারো আসতে হবে এখানে অফিসের কাজ নিয়েই।

কলতলায় এল নিতাই। ভাবলো, বেশ হত যদি নকুড় মামার সঙ্গে হাসিমারায় চলে যাওয়া যেতো এবার। বেশ ঘুরে আসা যেতো; দশ বারো দিন পর আবার ফিরেও আসা যেতো ওঁরই সঙ্গে। হ্যাঁ, এবার নকুড় মামার সঙ্গে সে যাবেই। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো নিতাই।

মুখ হাত ধোয়ার পাল্লা সেরে নিয়ে রান্নাঘরে মার কাছে এল নিতাই। গরম দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল—"মা, এবারে কিন্তু আমি নকুড় মামার সঙ্গে হাসিমারায় যাব।"

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে? ঘাড় ফিরিয়ে মা বললেন—ওখানে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে জানিস তুই! থাকতেই পারবি না।

—পারবোই পারবো, সোয়েটার কম্বল টম্বল সব নিয়ে যাব। বলল নিতাই—মাত্র তো কয়েকটা দিন মা?

—কিন্তু ওখানে সময় কাটাবি কি করে? নকুড়তো একা মানুষ; অফিসে বেরিয়ে গেলে খালি বাড়িতে সারাদিন কি করবি? ভালো লাগবে? দুধের গ্লাস খালি করে টেবিলে রাখল নিতাই। বলল—অনেকগুলো গল্পের বই নিয়ে যাব। সারাদিন পড়ব।

—তোর বন্ধুদের ছেড়ে এতদিন থাকতে পারবি? শেষে দেখবি আর একদম ভাল লাগছে না।

—তাহলে পরে পল্টুদেরও সঙ্গে নিয়ে যাই? উৎসাহভরে বলল নিতাই—খুব মজা হবে তাহলে? সবাই মিলে ঘুরে বেড়াব সারাদিন? কড়াতে কি যেন চাপিয়ে একমনে খুন্তি নাড়ছিলো ভজুয়া; এবারে বলল—সহি বাৎ, বহুৎ আনন্দ ভি মিলবে তব্…

—এই তো মা, ভজুদাও বলছে—তুমি একবার 'হ্যাঁ' বল না মা…বলতে বলতে এগিয়ে এসে মা'র পাশে উবু হয়ে বসল নিতাই।

—সর বাপু, জ্বালাস নি এখন, মা বললেন—ওদের বাড়ি থেকে যদি মত দেয়, তাহলে বরং নকুড়কে বলে দেখতে পারি একবার; যা এখন বিরক্ত করিস নে; হাতে অনেক কাজ।

মা'র মুখ থেকে কথাটুকু খসতে যে সময়; পরক্ষণেই 'হিপ হিপ হুর-রে' বলে একলাফে রান্নাঘরের বাইরে এল নিতাই; তারপর কোনমতে চটিটা পায়ে গলিয়েই হাঁটা দিল পালবাগানের দিকে। ওখানে হাজির থাকবে পল্টু, বিশু আর মলয়। গতকালই ঠিক হয়েছে, পরীক্ষার ফল বেরুবার আগে পর্যন্ত সময়গুলো কেমন করে কাটানো যাবে, তা নিয়েই আলোচনা হবে আজ। জোরে পা চালালো নিতাই। রোদের রঙ এখন অনেকটা উজ্জ্বল; মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। ফুরফুরে শীতল বাতাস বইছে থেকে থেকে।

বাগানের কাছাকাছি পৌঁছুতেই দেখা গেল পল্টুদের। চণ্ডী-মণ্ডপের চাতালে জমাট আড্ডা বসিয়েছে ওরা তিনজন।

—এই নিতে, শীগগির আয়; জায়গায় বসেই চেঁচিয়ে ডাকলো বিশু। দ্রুত পায়ে হেঁটে এল নিতাই। এ জায়গাটায় গাছপালা নেই বলে সকালের মিঠে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত চাতালে। তবুও শীত করছে বেজায়। এলোমেলো উত্তুরে বাতাসগুলো যেন বরফ-শীতল। বিশুর ঠিক পাশে এসে বসল নিতাই।

—তোর অনেক আগে এসেছি আমরা; বলল বিশু—কি করছিলি এতক্ষণ? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলি নিশ্চয়ই?

কথাটা সত্যি হলেও বেমালুম অস্বীকার করে গেল নিতাই। ওর কাছে স্বীকার করা চলবে না কোনমতে। যেমনি মোট্‌কা চেহারা ওর, ঠিক তেমনই মোটা বুদ্ধি। রগচটাও বটে। ওদিক ভেবেই বলল নিতাই—মোটেই না; ঘুম থেকে উঠেছি সে-ই কাক ডাকা ভোরে; আজ আমার নকুড় মামা আসবেন তা জানিস? আর সেই জন্যেই তো ফার্স্ট ক্লাশ একটা প্ল্যান করে···

—নকুড় মামা? মানে, সেই যে দার্জিলিঙ না ফাঁসিমারায় থাকেন? কথার মাঝেই জিজ্ঞাসা করল পল্টু।

—না; দার্জিলিঙ-এও না, আবার ফাঁসিমারায়ও না; গম্ভীর গলায় বলল নিতাই—থাকেন হাসিমারায়।

—হাসিমারা? খিলখিল করে হেসে বলল মলয়—সে আবার কোথায়? এমন নাম তো বাবা জীবনেও শুনি নি!

—তুই তো অনেক কিছুই শুনিস নি; বলল নিতাই—তা বলে অমন করে হাসবার কি আছে?

জবাবে কি যেন বলতে চাইছিল মলয়; কিন্তু তার আগেই ঝাঁকড়াচুলঅলা গোল মাথাটা সজোরে নেড়ে গর্জে উঠল বিশু—এ্যাই—চোপ্‌! আর একটা কথা বললেই ছুঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ সেলাই করে ভালো ছেলেটি হয়ে বসল মলয়। বলা যায় না। সত্যিই হয়তো বা কথাটা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে বিশু। যেমনি ইয়া চেহারা ওর—ঠিক তেমনই সাহস। পাড়ার ব্যায়ামাগারে রোজ বারবেল-ডাম্বেল ভেজে ভেজে তৈরি করেছে এই মোটা মোটা হাত পায়ের গুলি।

—ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল পল্টু—এখন কাজের কথায় এস সকলে। হ্যাঁ নিতে, কি যেন বলছিলি তুই? কি একটা নাকি প্ল্যান বের করেছিস ফার্স্ট ক্লাশ? সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল নিতাই। তারপর খুব গম্ভীর

গলায় ছুঁড়ে দিল প্রশ্নটা—বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে রাজী আছিস তোরা ?

—বাইরে মানে ? কোন্ বাইরে ? তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো বিশু।

—কোন্ বাইরে আবার ? কলকাতার বাইরে। যাবি ?

—কলকাতার বাইরে ? মানে···ট্রেনে চেপে ? সোৎসাহে বলল পল্টু—আলবৎ যাব ; তাই নারে মলয় ?

—হুঁ ; তেমন ভালো কোথাও হলে অবশ্য যাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো মলয়।

—কিন্তু যাবটা কোথায় বল তো ? গোল গোল চোখে বলল বিশু—যেখানে সেখানে গেলেই তো হল না। থাকবো কোথায় ! খাব কি ?

মৃদু হাসল নিতাই। বলল—কথাগুলো না ভেবেই কি আর যাবার কথা তুলেছি আমি ? ভাবছি, নকুড় মামার সঙ্গে ওঁর ওখানেই যাব এবার।

—মানে···সেই হাসিমারায় ?

—হ্যাঁ। বড়দার কাছে শুনেছি বড্ড সুন্দর নাকি জায়গাটা। পাহাড়ী এলাকা। তা ছাড়া গভীর একটা জঙ্গলও আছে ওখানে—হাতী বাঘ টাগ ঘুরে বেড়ায়। চারদিক গাছপালায় ভর্তি নিরিবিলি নির্জন জায়গা। গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না—এমন সুন্দর। যেতে চাস তো বল···।

—ফার্স্ট ক্লাশ ! চেঁচিয়ে বলল পল্টু—আমি রাজী।

—আমিও। বলল মলয়—পাহাড় দেখিনি কখনো ; আঃ, কী মজাই না হবে।

—আমি তো একশ ভাগ রাজী। জঙ্গল হল গিয়ে আমার সবচাইতে প্রিয় জিনিস···ফাইন ! বলতে বলতে ছুটে এসে নিতাইকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগলো বিশু।

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নিতাই। তারপর বিশুর হাত থেকে

কোনমতে নিজেকে মুক্ত করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—তাহলে সকলেই রাজী ? হৈ চৈ করে সমর্থন জানালো বাকি তিনজন।

—তাহলে কিন্তু রওয়ানা দিতে হবে পরশুর পরের দিন। বুঝলি ? সেদিনই হাসিমারায় ফিরে যাবেন নকুড় মামা। তারপর আবারো আসবেন ১০।১২ দিন পর ; তখন একসঙ্গেই ফিরে আসব আমরাও ?

—কিন্তু নিতে, হাসিমারা জায়গাটা কোথায় রে ? জিজ্ঞাসু চোখে বলল পল্টু—যেতে হয় কি করে ? জানিস ?

বড়দার মুখে শোনা কথাগুলো মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিয়ে সবজান্তার ভঙ্গিতে বলল নিতাই—না জানার কি আছে ? আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই হল জায়গাটা—ভূটান সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি ; জলপাইগুড়ি জেলায়। জলদাপাড়ার নাম শুনেছিস তোরা ?

ঘাড় নাড়লো মলয়। বলল—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি—সরকারী জঙ্গল আছে ওখানে ; অনেক গণ্ডার আছে নাকি জঙ্গলে। গণ্ডার ছাড়াও অবশ্য হাতি বাঘ হরিণ টরিন আছে। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। সরকারী জঙ্গল তো, ইচ্ছে মত শিকার করতে পারবে না কেউ।

ঐ জলদাপাড়ার সবচাইতে কাছের রেল স্টেশন হল হাসিমারা। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২০।১৩০ কিলোমিটার মত দূরে। যাকগে শোন, তাহলে কিন্তু ঠিক হল যে নকুড় মামার সঙ্গে আমরা সকলে হাসিমারায় যাচ্ছি ; তাই তো ?

সোল্লাসে সমর্থন জানালো সকলে।

উঠে দাঁড়ালো নিতাই। তারপর একটা দূর্বা ঘাসের ডগা দাঁতে কাটতে কাটতে বলল—আমি এখন চলি তাহলে। নকুড় মামা হয়তো এসে গেছেন এতক্ষণে। আর হ্যাঁ, শোন—বিকেলের দিকে আমাদের বাড়িতে কিন্তু আসবি তোরা ; নকুড় মামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।



বিকেলের দিকে পল্টু, মলয় আর বিশু এল নকুড় মামার সঙ্গে পরিচিত হতে। জানালা দিয়েই দেখতে পেল ওরা—কালো রঙের চাদর জড়ানো রোগা আর লম্বামত একজন লোক কি সব যেন ছবি দেখাচ্ছে নিতাইকে।

—ঐ লোকটাই বোধহয় নকুড় মামা। ফিসফিসিয়ে বলল পল্টু।

—হাসি পায় দেখলে। চাপা গলায় বলল মলয়।

গলার শব্দেই হয়তো বা এদিকে তাকিয়েছিলো নিতাই। ওদের দেখে একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে এল বাইরে।

—এই তো এসে গেছিস তোরা—শীগগির আয়।

ভেতরে এল সকলে। পরিচয় টরিচয়ের পালা শেষ হবার পর নকুড় মামা বললেন—তাহলে নিতাই-এর সঙ্গে তোমরাও যাচ্ছ? বাড়িতে মা বাবাকে বলেছ তো?

—আমার বাবা মত দিয়েছেন এক কথায়। সমস্ত মুখ জুড়ে হাসি নিয়ে বলল বিশু।

—আমাদেরও। সমর্থন জানালো পল্টু আর মলয়।

—খুব ভালো কথা। বললেন নকুড় মামা—তাহলে তৈরি হতে শুরু করে দাও সকলে। আর কিন্তু দুটো দিন হাতে। হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডা এখন—গরম জামা কাপড় যা আছে সব নিয়ে যেও; কেমন।

আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক অনেক গল্প করলেন নকুড় মামা। হাসিমারার জঙ্গলের কথা, পাহাড়ের কথা—তারপর চা বাগানে

চায়ের পাতা তোলবার কথা, আরো কত কিছু বললেন গল্পের মত করে। শেষে বললেন—একটা কথা, ওখানে কিন্তু আমার বাড়ির মাইলখানেক পর থেকেই শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল; হিংস্র জন্তু জানোয়ারও আছে ওখানে। কাজেই, কেউ কিন্তু ভুলেও যাবে না ওদিকে, বুঝলে?

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো সকলেই। এর মধ্যে নিতাই-এর মা ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। তিনিও নকুড় মামার কথাগুলোই বললেন। পরে হেসে বললেন—ঐ বিশেটাই ডানপিটে বেশি। ও ঠিক জঙ্গলে যাবে, দেখিস নকুড়।

গোল মাথাটা সজোরে নেড়ে প্রতিবাদ জানালো বিশু। ধরন দেখে হেসে উঠলেন নকুড় মামা। হাসলো পল্টু, মলয় নিতাইও।



দেখতে দেখতে মাঝের সময়গুলো পার হয়ে গেল অসম্ভব এক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। অবশেষে এল যাত্রার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটুকু। দার্জিলিঙ মেল চলতে শুরু করল। রাতে অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটল না। ট্রেন চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ পর খাওয়া দাওয়া সেরে গরম চাদর মুড়ি দিয়ে সেই যে ঘুম লাগালেন নকুড় মামা, উঠে বসলেন ভোর নাগাদ। বিশু আর মলয়েরও সেই একই অবস্থা। এক ঘুমেই রাত কাবার। পল্টু অবশ্য ঘুমুতে পারে নি তেমন। মাঝ রাতে জমে আসা ঘুমটা ফরাক্কা ব্রীজ পেরুবার সময় ঘটাং ঘটাং শব্দে হঠাৎ ভেঙ্গে যাবার পর থেকে আর ভালোমত ঘুমুতেই পারে নি সে। ঝটকা মেরে ঘুমটা

ভেঙ্গে গিয়েছে বারবার। তবে সবচাইতে কাহিল হল নিতাই-এর অবস্থা। শিয়ালদহে গাড়িতে ওঠামাত্রই ঠিক কোণাকুণি সীটে বসা ওভারকোট পরা লম্বামত লোকটাকে একনজর দেখেই "সন্দেহজনক ব্যক্তি" বলে ভেবে নিয়েছিল সে ; ভাবার অবশ্য কারণও ছিল যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত যতগুলো ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েছে নিতাই, তার প্রায় সবগুলোতেই হত্যাকারীর যেমন চেহারা বর্ণনা করা আছে, লোকটার সঙ্গে যেন হুবুহু মিলে যায়। তা ছাড়া, সদ্য পড়া "নিহত শকুন"-এর ডিটেকটিভ প্রাণবল্লভ শর্মার কথাগুলো যেন বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করেছিল মাথার একেবারে ভেতরটায় এবং লোকটার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথাগুলো মুখস্থও বলে ফেলেছিল নিতাই—"সদ্যকৃত কুকর্মের পর তার মুখাকৃতি আড়াল রাখতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালায় হত্যাকারী।" আশ্চর্য! ট্রেনে পা দেওয়া মাত্রই লোকটাকে সেই যে মুখে রুমাল চাপা দেওয়া অবস্থায় দেখেছিল নিতাই, ঠিক ঐ ভাবেই ছিল সর্বক্ষণ। মুখ থেকে রুমাল সরায় নি একটি বারও। নিশ্চিতভাবে আড়ালে রাখতে চেয়েছিল নিজের মুখখানা। কিন্তু কেন? কে ও? প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মত নজর রেখেছিল নিতাই। আরো বেশিক্ষণ সময় দিলে হয়তো বা পরিষ্কার হত ব্যাপারটা। কিন্তু হঠাৎ চাদর সরিয়ে "এই নিতে, বসে আছিস কেন? শুয়ে পড় শীগগির" বলে যখন ধমক লাগালেন নকুড় মামা, একরকম বাধ্য হয়েই শুয়ে পড়তে হল তারপর।

এরপর অবশ্য নজরে রাখা সম্ভব হয় নি আর। কিন্তু চোখ কান খোলা রেখে সতর্ক হয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। কোন্ অপকর্মের নায়ক লোকটা কে জানে এবং পূর্বেই যেহেতু দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল দু'তিনবার, হয়তো বা সন্দেহ করতে শুরু করেছে ওকেই। বলা যায় না, উদ্যত ছোরা হাতে আক্রমণও করে বসতে পারে যখন তখন।

গোটা রাত নিজের জায়গায় উসখুস করবার পর ভোরের দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল নিতাই। ঘুম ভাঙ্গতেই শুনলো নকুড় মামার গলা। কাকে যেন বলছেন—দাঁতের রোগ মশাই ভীষণ ভোগ ; দু'দুটি বছর ভুগে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল নিতাই। দেখলো—নকুড় মামার দিকে তাকিয়ে মুখে রুমাল চাপা দেওয়া অবস্থাতেই বলছে গত রাতের সেই "সন্দেহজনক" লোকটা—বিকেলের দিকে দাঁতটায় পেইন উঠল হঠাৎ। দু'চার দিন আগে হলে তুলেই ফেলতাম একেবারে। দার্জিলিঙ-এ বেশ ভোগাবে দেখছি।

হাই তুলে নীচে নামলো নিতাই। পল্টু বিশু ওরা এর মধ্যেই এসে বসেছে জানালা ঘেঁষে। রোদ অবশ্য ওঠেনি এখনও ; তবে সকালের আলোয় আলোকিত চারদিক। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে জানালার ভারী কাচের মধ্য দিয়ে।

—কিরে, কেমন ঘুমুলি ? পল্টুর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে লোকটার দিকে আড়চোখে একবার তাকালো নিতাই। এতক্ষণে মুখ থেকে রুমাল সরিয়েছে লোকটা। বাঁ দিকের গালটা বেশ ফোলা —চোখদুটোও লাল লাল। ছোট্ট করে শ্বাস ফেললো নিতাই। ভাগ্যিস গতরাতের সন্দেহের কথাটা বিশুকে বলে নি সে! কি কেলেঙ্কারিই না হত তাহলে।

প্রায় ৬টা বাজে এখন। নকুড় মামার কথামত ৬-৪৫ মিঃ নাগাদ নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছুবার কথা। সেদিক ভেবেই বিশুর পাশে বসবার জায়গা করে নিতে নিতে বলল নিতাই—প্রায় এসে গেলাম। আর ৪০।৪৫ মিনিট লাগবে।

ডানদিকের মোটাসোটা লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো নিতাই-এর কথায়। গলার মাফ্লারটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা। তারপর "আরো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ; গাড়ি লেট আছে" বলে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

নকুড় মামা ওপরের বার্থে শুয়েছিলেন এখনো ; ওখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন—তোদের ক্ষিদে পেলে খেয়ে নিস। এতে খাবার আছে। বলে ওঁর সাইড ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিলেন নীচের দিকে।

ঝটপট খাবার পালা শেষ করে বাড়ি থেকে আনা "অন্ধকার রাত্রি" বইটা খুলে বসল নিতাই। বিশু আর পল্টু মন দিল বাইরের দৃশ্যে ; আর মলয় ঝিমুতে লাগলো বসে বসেই।



সাড়ে সাতটা নাগাদ ট্রেন এল নিউ জলপাইগুড়িতে। স্টেশনে নেমে 'টি-স্টল' থেকে চা-এর পর্ব শেষ করে বাইরে এলেন নকুড় মামা। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। আকাশ মেঘলা, রোদ নেই এতটুকু। কেমন যেন ভিজে ভিজে ভাব চারদিকে। হয়তো বৃষ্টি হয়েছিল রাতে। দাঁড়া এখানে, কোন ল্যাণ্ডরোভার যাচ্ছে নাকি দেখে আসি। এই বলে ডানদিকের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলেন নকুড়মামা।

—ল্যাণ্ডরোভার কিরে ? জানিস ? ভুরু কুঁচকে তাকালো পল্টু। বড়দার কাছে শোনা কথাগুলো একবার ঝালিয়ে নিয়ে বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল নিতাই—একধরনের মোটরগাড়ি এটা। জীপ গাড়ির মত দেখতে অনেকটা ; তবে আরো বড়। এগুলো পাহাড়ী পথে চলাফেরায় ওস্তাদ।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে বাস স্ট্যাণ্ড ; "দার্জিলিঙ কার্সিয়ঙ" বলে চেঁচাচ্ছে কণ্ডাক্টর। অনেকগুলো প্রাইভেট গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের লোহার রেলিঙ ঘেঁষে। শুকনো কাঠখোট্টা চেহারার লোকটা কোট

আর চারপাশের ঘন কালো অন্ধকারগুলো যেন অতি উৎসাহে নাচানাচি করে বেড়ায় হা হা করে।

এখানে আসবার পর খাওয়া দাওয়া আর হৈ হট্টগোলের মধ্য দিয়ে প্রথম দুটো দিন যে কোন্ ফাঁকে পার হয়ে গেল, টেরই পেলনা কেউ। কিন্তু, অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটলো ঠিক তার পরের দিন।

বেশ জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে সেদিন। বরফ-শীতল বাতাসগুলো যেন সোয়েটার কোট ভেদ করে দাঁত বসাতে চাইছে একেবারে হাড়ের ভেতর। গত দু'দিনের মত আজও বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে নিতাই ওরা। জঙ্গলমুখো পথ ধরে চলে এসেছে অনেকটা দূরে। সন্ধ্যা এখনো নামে নি বটে, তবে বিকেলের আলো পড়ে এসেছে প্রায়।

—এই আর যাব না রে ; ফিরে যাই চল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল নিতাই।

—সে কিরে! এখনই ফিরে গিয়ে কি করব? ঝাঁকড়াচুলঅলা মাথাটা সজোরে নেড়ে বলল বিশু।

—মানে বলছিলাম কি···এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল নিতাই—মানে এদিকের রাস্তাটা তো খুব খারাপ, তাই আর কি······

—খারাপ তো কি হয়েছে? চোখ নাচিয়ে পল্টু বলল—চল্ না আরো খানিকটা যাই ; তা ছাড়া জঙ্গলটাতো এদিকেই—।

—ইয়েস! লাফিয়ে উঠলো বিশু—চল্, জঙ্গলে যাব আমরা। নিতাই এর অবশ্য যাবার ইচ্ছে ছিল না তেমন। বিশুই একরকম জোরজার করে নিয়ে চলল ওকে। দু'পা হাঁটতেই দেখা হয়ে গেল সেনগুপ্তবাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকের পুরোনাম অমিত সেনগুপ্ত। নকুড়মামার বাড়ি থেকে প্রায় মিনিট দশেক মত পথ দূরে ওঁর বাড়ি। ভালো তাস খেলতে পারেন। রোজ সন্ধ্যেবেলায় তাসের আসর বসে সেনগুপ্তবাবুর ঘরে। অনেকে আসেন তখন। নকুড়মামাও কালোরঙের একটা চাদর জড়িয়ে যোগ দিতে যান তাসের আসরে।

এখানে আসবার প্রথম দিনেই পল্টুদের সেনগুপ্তবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে টিটোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন নকুড় মামা। টিটো হল সেনগুপ্তবাবুর ছেলে। ওদেরই সমবয়সী। বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সাথে সাথেই। সন্ধ্যেবেলায় নকুড় মামা ওরা সব তাসের আসরে বসে গেলে পরে ক্যারম বোর্ড নিয়ে অন্য ঘরে বসত টিটো, পল্টু, বিশু আর মলয়। নিতাই আবার ক্যারম খেলতে ভালোবাসে না। কাজেই একটু তফাতে গিয়ে ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ত সে। অনেক বই আছে টিটোর। আর হ্যাঁ, ওদের ওখানে যাতায়তের ফলেই নকুড়মামার আরো কয়েকজন বন্ধুকে চিনে নিয়েছিল ওরা। এঁদের মধ্যে আছেন অরূপ দত্ত, হরিদাস চন্দ আর নির্মল সোম। হরিদাস চন্দ অবশ্য ভীষণ বদমেজাজী ; প্রথম আলাপে পাত্তাই দিতে চান নি ওদের। সবচাইতে ভালো লেগেছে নির্মল সোমকে। খুব ভালোবাসেন ছোট ছোট ছেলেদের।

জঙ্গলের পথে ওদের দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন সেনগুপ্ত বাবু। বললেন—কি গো, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় সব চললে কোথায় ?

—ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, বলল পল্টু।

—না না ; আর যেও না। জঙ্গলের পথ ; সাপ খোপ বেরুতে পারে। তাছাড়া আলোও তো কমে এসেছে।

—এখনই যাব ? অনিচ্ছাভরে বলল মলয়—সেনমামা আপনি এগোন ; পেছন পেছন আসছি আমরা।

—ঠিক আছে ; এস তাহলে—আমি হাঁটি। হনহন করে হেঁটে গেলেন সেনগুপ্ত বাবু।

বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সকলে ; তারপর সেনগুপ্ত দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যাওয়া মাত্রই হৈ হৈ করতে করতে রওয়ানা দিল জঙ্গলের দিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে পড়েছে এখন। তার ওপর বড় বড় সব গাছপালাগুলো এমন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে যে

একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে ভেতরটায়। শুকনো একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দু'ধারের ছোট ছোট গাছগুলো পেটাতে পেটাতে অনেকটা দূরে এগিয়ে গিয়েছিল মলয়। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল—এ-ই, সব এদিকে আয়। একটা জিনিস দেখ···।

হাড় কাঁপানো ঘন অন্ধকারের মধ্যেও আবছাভাবে চেনা যাচ্ছিলো গজ পনের দূরের ভাঙ্গাচোরা একতলা বাড়িটা। কিন্তু এমন গভীর জঙ্গলের ভেতর বাড়ি কেন? বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলো মলয়।

—কই, কি বলছিস? এগিয়ে এল পল্টু, বিশু আর নিতাই।

—ঐ গ্যাখ, একটা পড়ো বাড়ি—।

—ও বাবা ভূত টুত থাকে নাকি ওখানে! গা ছমছম করছে কেমন যেন। কাঁপা গলায় বলল নিতাই। আর ঠিক এই মুহূর্তেই ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা। জোরালো টর্চের একঝলক আলো বাড়িটার ওপর পড়েই নিভে গেল হঠাৎ। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো চার চারটে মাথা। পর পর তিনবার একইভাবে টর্চের আলো পড়েই নিবে যাবার পর মিটমিটে লণ্ঠন হাতে ধরা একটা মানুষ বেরিয়ে এল যেন কোথা থেকে।

—কিরে, দেখেছিস? বিশুর হাতে চিমটি কেটে ফিসফিস করল মলয়। প্রবল উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল পল্টু। কোনমতে বলল—মলয়, কথা বলিসনে, ঐ গ্যাখ্।

ইতিমধ্যে যেন মাটি ফুঁড়ে বাড়িটার বারন্দায় উঠে এসেছে মাথায় ফেল্ট হ্যাট আর গায়ে ওভারকোট জড়ানো এক ছায়ামূর্তি। হাতে লণ্ঠন ধরা লোকটা যেন বাক্সমত কি একটা জিনিস এগিয়ে দিল। আর সাথে সাথেই বারান্দা থেকে নেমে ঝোপের ভেতর মিশে গেল ওভারকোট পরা লোকটা। ঘন কালো অন্ধকারে এরপর ডুবে গেল চারদিক।

—কি হলরে ? বিশুর প্রশ্নে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল সকলেই। কিন্তু উত্তর দেবে কে ? সবার মাথাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ একটিই প্রশ্ন—কি হল এতক্ষণ ?

—চল, ফিরে যাই বরং। থেমে থেমে বলল পল্টু—কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার। ডাকাত টাকাত হতে পারে কিন্তু।

—ডাকাত, হুঁ ! এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে পল্টুর দিকে সরাসরি তাকালো নিতাই। তারপর অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল—ডাকাত না ; আমার মনে হয় ঐ ওভারকোট পরা লোকটা কোন খুনী-টুনি হবে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে দিনের আলোতে। ডিটেকটিভ বইগুলোতে কিন্তু এইসব ওভারকোট পরা লোকগুলোই খুনী হয়।

নিতাই-এর কথাগুলো কিন্তু খুব মন দিয়েই শুনলো সকলে। আজ পর্যন্ত কম করেও প্রায় একশ গল্পের বই পড়েছে সে। কাজেই এসব ব্যাপারে ওর মতামতটা ফেলে দেওয়া যায় না চট করে।

—তাই নাকি ? সন্ত্রস্ত গলায় বলল মলয়—আজ তাহলে বরং ফিরে যাই চল। কাল না হয় সকালের দিকে আসব আর একবার।

—চল তাহলে। বাড়ির দিকে হাঁটা দিল সকলে।

—কিন্তু কথাটা কি জানিস ? লোকটা যদি খুনীই হয়, তবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না আমাদের, যে করেই হোক গ্রেপ্তার করে তুলে দিতে হবে পুলিশের হাতে।

সদ্য পড়া "নরকের রক্ত" বই-এর ডিটেকটিভ জাঁদরেল পাণ্ডের কথাগুলো হুবহু মুখস্থ বলে গেল নিতাই।

কথাটা মনে ধরল বিশুর। গোল মাথাটা সজোরে নেড়ে বলল—ঠিক বলেছিস নিতে। আমাদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে ঐ খুনীটাকে। কি, রাজী সকলে ?

সমর্থন জানালো সকলেই।

—ব্যাস। বলল বিশু—তাহলে কাল সকাল থেকেই কাজ

শুরু করে দেব আমরা। কিন্তু, মনে রাখবি, নকুড় মামা যেন মোটেই জানতে না পারেন। সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে তাহলে।

হৈ হৈ করতে করতে বাড়ির দিকে জোর পা চালালো সকলে।



পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ভাবে কাজ শুরু করা হবে তার একটা ছক তৈরি করে ফেললো চারজনে মিলে। ঠিক হল বিশুকে সঙ্গে করে আটটা নাগাদ সোজা ঐ বাড়িটাতে চলে যাবে নিতাই। সন্দেহজনক কি কি বস্তু আছে ওখানে, তা খুঁজে বের করবার দায়িত্ব হল নিতাই-এর। এদিকে বাড়ির আশপাশের জঙ্গলগুলো খুব ভালো করে পরীক্ষা করবে মলয়। ওর লক্ষ্য থাকবে জুতোর ছাপ, সিগারেটের পোড়া অংশ, দেশলাই কাঠি—এসব জিনিসের ওপর। বাকি থাকে পল্টু। ওর কাজ হবে অমিত সেনগুপ্তের পিছু নেওয়া। গত সন্ধ্যায় এই জঙ্গল থেকেই ভদ্রলোককে বেরুতে দেখেছে চারজনে।

ছক তৈরির পালা শেষ হলে পরে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল ঝটপট। নিতাই, বিশু আর মলয় রওয়ানা দিল জঙ্গলের দিকে আর পল্টু গেল টিটোর ওখানে। পথেই দেখা হয়ে গেল নকুড় মামার সঙ্গে। অফিসে বেরুচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, সব চললি কোথায়?

—এই জ···। নিতাই এর চিমটিতে "জঙ্গলের দিকে" কথাটার "জ" পর্যন্ত বলেই থামলো মলয়। ইস্, আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল আর কি! ডিটেকটিভদের গতিবিধি কাকপক্ষী পর্যন্ত

টের পায় না, আর ও কি-না আসল কথাটাই ফাঁস করে দিচ্ছিলো! খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মলয়—মানে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা।

—বেশ বেশ। হেসে বললেন নকুড় মামা—আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে যাও; সুন্দর একটা শিবমন্দির আছে ওখানে।

—ঐ দিকে? প্রশ্নবোধক চোখে আঙ্গুলে ইঙ্গিত করল বিশু।

—হ্যাঁ, ঐ দিকেই; আচ্ছা, তোমরা যাও তাহলে; আমার আবার তাড়া আছে একটু।

চলে গেলেন নকুড় মামা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো নিতাই।

—কি রে, যাবি না? ভাবছিস কি অত? মলয়ের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল নিতাই—আচ্ছা, তোরা কি লক্ষ্য করেছিস যে আমাদের বাঁ দিকের পথে যেতে বললেন নকুড় মামা?

—হ্যাঁ; শিবমন্দির দেখতে বললেন। কিন্তু, কি হয়েছে তাতে? বই-এর ডিটেকটিভদের মত অল্প একটু হাসলো নিতাই। বলল—আসলে কিন্তু সে জন্যে বলেন নি।

—তবে?

—তবে আর কি? নকুড় মামার ইচ্ছে আমরা যেন জঙ্গলের দিকে না যাই। গেলে পরে হয়তো সেই বাড়িটা নজরে আসতে পারে; আর তাহলেই···

—তার মানে নিতে···তার মানে তুই বলছিস যে নকুড় মামাও সন্দেহজনক ব্যক্তি! চোখ বড় বড় করে বলল বিশু।

—নিশ্চয়ই। মৃদু হেসে "শকুনের কান্না" বই-এর পুলিস ইন্সপেক্টর শিবরাম হালদারের কথাগুলো একবার ঝালিয়ে নিয়ে বলল নিতাই—তদন্তের শুরুতে চেনা মানুষ তো দূরের কথা, প্রতিটি ইট, কাঠ পর্যন্ত সন্দেহজনক বস্তু।

অবাক চোখে শুনে গেল বিশু আর মলয়। নকুড় মামা যে সন্দেহজনক ব্যক্তি এ-কথা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ওরা।

আরো খানিকটা এগুবার পর গতকালের সেই বাড়িটার কাছে এল বিশু আর নিতাই। মলয় অবশ্য আলাদা হয়ে গেছে আগেই। সকালের উজ্জ্বল আলোতে এখন পরিষ্কার ভাবে নজরে আসছে বাড়িটা। প্রায় ক্ষত বিক্ষত লাল রঙের একতলা বাড়ি। দেখেই বোঝা যায় যে বহুদিন ধরে কোন মানুষ বাস করে না এখানে। চারপাশ ঘিরে কোন এক কালে সিমেণ্ট বাঁধানো প্রাচীর ছিল বটে, তবে এখন রয়েছে তারই কঙ্কাল। ইট খসে পড়ে পড়ে 'হা' হয়ে আছে এদিক ওদিকে। নড়বড়ে লোহার গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো দু'জনে। বুনো ঝোপ আর কাঁটাগাছে ভর্তি সামনের একফালি জমিটুকু। গা বাঁচিয়ে কোনমতে বারান্দায় উঠে এল দু'জনে। উই ধরা কাঠের বন্ধ দরজাটায় ঝুলছে মরচে ধরা ইয়া বড় একখানা তালা। হাত দিয়ে একবার মোচড় দিল বিশু। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল, কিন্তু খুলল না।

দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিল নিতাই। বড্ড অন্ধকার ভেতরে; কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চোখ সরিয়ে এদিক ওদিকে তাকাতেই দরজার নীচে চোখ পড়ল হঠাৎ। হালকা কালো রঙের মাঝারী আকারের একখানা গোল বোতাম পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিল নিতাই। তারপর বই-এর ডিটেকটিভদের মত জিনিসটা রুমালে মুড়ে রেখে বলল গম্ভীর গলায়—চল্, ওদিকটা দেখব এবার।

বারান্দার শেষ প্রান্তে এলো দু'জনে। উবু হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুটিয়ে পরীক্ষা শুরু করল নিতাই।

—এই, এই পা দিস নে এখানে; বিশুকে এগিয়ে আসতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল নিতাই।

—কেন? কি আছে এখানে?

—জুতোর ছাপ দেখেছিস? ঐ ছাখ্।

দেখলো বিশু। সত্যি, জমাট ধুলোর ওপর যেন ভেসে রয়েছে খাঁজ কাটা ছাপগুলো।

—হুঁ ; ক্রেপ সোলের জুতোর ছাপ এগুলো। গম্ভীর গলায় বলল বিশু।

—কি করে জানলি ?

—আমার বাবার জুতোর ছাপও ঠিক এইরকম।

প্রবল বিস্ময়ে ঘাড় ফেরালো নিতাই। তাহলে পরে বিশুর বাবাও কি এ ব্যাপারে জড়িত ? কিন্তু, তাই-ই বা সম্ভব কি করে ? তিনি তো এখন কলকাতায়। নাঃ, ক্রমেই যেন ঘোরালো হয়ে উঠেছে সবকিছু।—কিরে ? হাঁ করে ভাবছিস কি ? বিশুর প্রশ্নে চমকে উঠলেও নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল নিতাই—ভাবছি, এই ছাপগুলোর ছবি নেওয়া যায় কেমন করে ? ক্যামেরা তো নেই আমাদের।

হাসলো বিশু : বলল—কত লোকই তো এমন জুতো পরতে পারে। তা বলে ওরা সকলেই কি খুনী ?

—তা অবশ্য না-ও হতে পারে। তবে জুতোর ছাপই হল গোয়েন্দাদের এক নম্বর হাতিয়ার। চোখ ঘুরিয়ে প্রাণবল্লভ শর্মার আরো একটা কথা মুখস্থ বলে গেল নিতাই।

—তাহলে পরে কি করবি এখন ? চিন্তিত মুখে তাকালো বিশু।

—দেখি। চোখ বুজে ছ'সেকেণ্ড ভাববার পরই হঠাৎ বাঁ হাতে একটা তুড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নিতাই—পেয়ে গেছি। দরকার নেই ক্যামেরার। পকেট থেকে একখানা ফুলস্কেপ কাগজ আর একটা পেন্সিল বের করল ও। তারপর খুব সন্তর্পণে কাগজটা জুতোর ছাপের ওপর বসিয়ে চাপ লাগালো পুরো ছ'ছুটি মিনিট। পরে কাগজটা সরিয়ে এনে বেশ খানিকক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মোটামুটি ধরণের একটা ছবি এঁকে ফেললো সে।

—বাঃ, সুন্দর এঁকেছিস তো ! একনজর দেখে বলল বিশু।

উত্তরে কি যেন বলতে চাইছিল নিতাই ; কিন্তু বলা আর হয়ে

উঠল না ; ঠিক ঐ মুহূর্তেই কানে ভেসে এল রক্ত জল করা এক অট্টহাসি। হা-হা-হা।

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো বিশু ; আর থরথর করে কেঁপে উঠল নিতাই। বারান্দার ঠিক অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাসছিলো পাক্কা ছ'ফুট লম্বা বীভৎস চেহারার লোকটা। এক মাথা বড় বড় চুল। ডান হাতে ধরা ছোট্ট একখানা বাঁশের লাঠি। আর বাঁ হাতটা মুঠো করে রেখেছে ওদেরই দিকে। পরণে শতচ্ছিন্ন ময়লা ধুতির সঙ্গে রয়েছে অনেকটা আলখাল্লা মত কালো রঙের জামা। গোটা মুখে এমন ভাবে চুণ কালির প্রলেপ, যে দেখলেই কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে বুকের ভেতরটা। এক পা পিছু সরতে চাইছিলো বিশু।

—হল্ট! হাতের লাঠিটা বন্দুকের মত তুলে ধরে গর্জে উঠল লোকটা—এক পা নড়লেই হামলোক ফায়ার ইউ।

আড়চোখে তাকালো নিতাই। লোকটা বাঙ্গালী, না হিন্দুস্থানী, না ইংরেজ—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সব কটি ভাষা মিলিয়েই কথা বলছে। কিন্তু কে ও? শত্রুদলের কেউ কি? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে।

হি হি করে হঠাৎ হেসে উঠল লোকটা। তারপর লাঠিটা মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—কৌন হো তুম্‌? ইউ নো, আমি হলাম চণ্ডালেশ্বর প্রসাদ ; আর হামারা ফাদার্স নেম জটিলেশ্বর প্রসাদ।

বাবার নাম শুনে এমন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেও হাসি পেয়ে গেল নিতাই-এর। খুব একটা সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে না লোকটাকে। হাসতে দেখলে হয়তো বা ছুঁড়ে মারতে পারে হাতের লাঠিটা।

—হোয়াট্‌! আবার গর্জে উঠলো লোকটা—হোয়াই সায়লেণ্ট ; এখানে বসে ক্যায়া করতা হ্যায়? এ্যানসার—।

—মানে···এখানে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। ভয়ে ভয়ে বলল বিশু।

—বেড়াচ্ছিলাম! নাকি সুরে কথাটা একবার উচ্চারণ করেই বারান্দায় উঠে এল লোকটা; চীৎকার করে বলল—ক্যায়া বেড়াচ্ছিলাম? এটা কি 'বেড়াচ্ছিলাম' কা প্লেস? আই সার্চ ইউ! তুম লোগকা পকেট সার্চ করিবে হামি—।

প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজটা শক্ত করে চেপে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল নিতাই। লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুখে অবশ্য সার্চ করবে বলল; কিন্তু হাবভাবে সে কথা মনে হচ্ছে না। মাথা চুলকে উসখুস করল বিশু। আম্‌তা আম্‌তা করল তারপর—আমাদের পকেটে কিছু নেই; আমরা—, কথা শেষ করবার আগেই হা হা শব্দে অট্টহাসি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা—হোয়াট! পকেট মে কিছু নেহি হ্যায়!

কথাটায় যে হাসবার অত কি আছে বুঝে উঠতে পারলো না বিশু। গোল গোল চোখে চেয়ে রইল কেবল। একই ভাবে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি বন্ধ করল লোকটা। তারপর হাতের লাঠিটা বন্দুকের মত আকাশের দিকে তুলে ধরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। বিড়বিড় করে কি যেন বললও একবার। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলো—ইউ চলা যাও; হাম্ ছোড় দিয়েছি—।

"চলা যাও" কথাটা শুনেই পিছু ফিরতে যাচ্ছিলো বিশু। কিন্তু হাতে চিমটি কেটে সতর্ক করল নিতাই। ফিসফিসিয়ে বলল—আর একটু দাঁড়া; সত্যিই যেতে বলছে কি না দেখি।

একটু সময় তাকিয়ে দেখলো লোকটা; হাতের লাঠিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ক্যাচ লুফলো একবার; গর্জে উঠলো তারপর—নেহি যাবে? ঠিক আছে—আই গো। রিপোর্ট করেগা তুমাদের নামে।

পি-ছে মু-র্—নিজেই চীৎকার করে মিলিটারী কায়দায় পিছু ফিরলো লোকটা। তারপর সিঁড়ি ধরে নেমে "লেফট-রাইট" "লেফট রাইট" বলতে বলতে মিশে গেল জঙ্গলের ভেতর।

এতক্ষণ পর যেন প্রাণ ফিরে পেল নিতাই। প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে এক গাল হেসে বলল—উঃ, কি মজার লোকরে বাবা !

—পাগল-টাগল হবে বোধ হয়। বলল বিশু—সার্চ করতে চায় আবার !

—ভাগ্যিস করে নি ; কাগজটা নিয়ে যেত তবে।

—নিলেই হল ? গোল মাথাখানা সজোরে নেড়ে বলল বিশু—বাছাধন টের পেত তাহলে। আচ্ছা নিতে ?

—বল্

—লোকটা যাবার সময় কি বলে গেল শুনেছিস তো ? আমাদের নামে নাকি রিপোর্ট করবে। হুঁঃ—বদ্ধ পাগল।

একটু সময় চুপ করে রইল নিতাই। তারপর সবে শুরু করা "কবরের অভিশাপ" বই-এর ডিটেকটিভ বিশ্বকর্মা বসাকের কথাগুলো ভেবে নিয়ে বলল—বদ্ধ পাগলের হাত থেকেই অনেক সময় বেরিয়ে পড়ে রহস্যের মূল চাবিকাঠি।

কি বুঝলো কে জানে ; তবে বড় বড় চোখে জিজ্ঞাসা করল বিশু—তার মানে নিতে, ঐ পাগলটার হাতেই দরজায় ঝোলানো তালাটার চাবিকাঠি ছিল ?

বিরক্ত হল নিতাই। এত ভেবেচিন্তে কথাটা বলাই বৃথা হল। এক বর্ণও বুঝল না বিশু—এমনিই মোটামাথা ওর।

—ঐ চাবিকাঠির কথা আমি বলি নি। এদিক ভেবেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল নিতাই। উত্তরে বিশু কিছু বলবার আগেই উত্তেজিত ভাবে ছুটতে ছুটতে এল মলয়। চুল টুল সব উস্কোখুস্কো। হাঁফাচ্ছে ভীষণ।

—কি হয়েছে রে মলয় ? ধীর ভাবে প্রশ্ন করল নিতাই।

—দাঁড়া, একটু রেস্ট নিতে দে ; দম ফেলে বলল মলয়—যা দেখে এলাম ! বাঃ—বাঃ !

—ধুত্তোর রেস্ট নেওয়া! অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল বিশু—আগে বল্, পরে বরং যত ইচ্ছে রেস্ট নিস্।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বা নিজেকে শক্ত করবার প্রচেষ্টা চালালো মলয়। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল—শোন্ তবে ; তোরা দু'জন তো চলে এলি এ বাড়িতে ; আর আমি গেলাম ঐ ঘন জঙ্গলে। উঃ, কী ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ভেতরে! তবুও এগুচ্ছি আমি, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিও—যদি কিছু পাওয়া যায়। পেলামও কিছু, এই দেখ্—।" প্যাণ্টের বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বটপাতার একটা মোড়ক বার করল মলয়।

—দেখি? হাতে নিয়ে জিনিসটা খুলল নিতাই। পেন্সিল টর্চের একটা ব্যাটারী, সিগারেটের গোটা কয়েক পোড়া টুকরো আর একখানা শুকনো রজনীগন্ধা ফুল রয়েছে ভেতরে।

—এগুলো কিন্তু ফিল্টার সিগারেটের টুকরো ; বলল বিশু—আমার বাবা এই সিগারেট খায়।

চকিতে ঘাড় ফেরালো নিতাই। বিশুর বাবা এই সিগারেট খান ; তা ছাড়া একটু আগে ঐ লালবাড়িতে পাওয়া জুতোর ছাপের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে ওঁর জুতোর ছাপ। তাহলে পরে নিশ্চিত ভাবে তিনিও এ ব্যাপারটায় জড়িত। কিন্তু, তবুও যেন মেনে নেওয়া যাচ্ছে না কথাটা। তাহলে পরে···তাহলে পরে···নাঃ, রহস্য যেন ক্রমেই গভীরে প্রবেশ করছে।

—কি হলরে নিতে? কিছু বলবি তো? ভাবছিস কি অত? মলয়ের প্রশ্নে নিজেকে দ্রুত বাস্তবে নিয়ে এল নিতাই। বলল—ভাবছি দেশলাই কাঠি আর পোড়া সিগারেটের টুকরোর সঙ্গে রজনীগন্ধা ফুল এল কি করে? ওখানে কি এই ফুলের গাছ আছে?"

খুক্ খুক্ করে গর্বের হাসি হাসলো মলয় ; বলল—গাছ থাকলে কি আর আনতুম ফুলটা? নেই বলেই তো সন্দেহজনক বস্তু বলে নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছিস ; বলল বিশু—এখন বল্ দেখি, জঙ্গলে কি দেখেছিস ?

—হ্যাঁ, শোন তারপর। জিনিসগুলো বটপাতায় মুড়ে জঙ্গল থেকে তখন বেরিয়ে আসব বলে ভাবছি—হেঁটেছিও দু'পা ; এমন সময় কানে এলো এক পাল শেয়ালের এক বীভৎস চীৎকার। ঠিক যেন আমার পেছনে বসেই চেঁচাচ্ছে শেয়ালগুলো। ব্যাস, আমি তো ভয়ে হিম্ ; দাঁড়িয়ে পড়লাম নট নড়নচড়ন হয়ে। আর ঠিক ঐ মুহূর্তে পেছনের ঝোপটা নড়ে উঠল হঠাৎ—স্পষ্ট কানে এল পাতা মাড়াবার মচ্ মচ্ শব্দ। এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ থামলো মলয়। মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিকে তাকিয়ে নিল দ্রুত।

—তারপর ? তাগাদা লাগালো বিশু।

—ভাবলুম হয়তো বা শেয়ালগুলোই বেরুচ্ছে ঝোপ থেকে। আর, এই ভেবে যেই না পেছনে তাকিয়েছি, দেখি কি—বীভৎস চেহারার একটা মাথা……।

—মাথা ! মানুষের মাথা ? দ্রুত প্রশ্ন করল নিতাই।

—মানুষ না কিসের মাথা কে জানে। বাকি শরীরটা তো আর দেখতে পাই নি। গাছের আড়াল থেকে মাথাটা উঁকি দিয়ে আছে দেখলাম কেবল। ঠিক যেন একটা রাক্ষস। গোল গোল চোখ—ইয়া বড় দাঁত, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটের কষ বেয়ে। উঃ, কি বলব তোদের, একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। নিশ্চয়ই ভূত হবে ; ভূত ছাড়া অমন চেহারা আর কারোর হতেই পারে না।

—তারপর ? কি করলি তারপর ? উত্তেজিতভাবে বলল বিশু।

—তারপর আর কি ? রামনাম জপতে শুরু করলাম খুব জোরে জোরে। জানি তো, রামনাম করলে ভূত বা রাক্ষস যে-ই হোক্ না কেন, ধারে কাছে এগুতে পারবে না। কাজেই রামনাম জপ করছি আর পায়ে পায়ে পিছু সরছি। এমনি করে যখন বেশ কয়েক পা চলে এসেছি, হঠাৎ মিলিয়ে গেল মাথাটা। ব্যাস্, প্রাণপণে পোঁ—

পাঁ দৌড় মারলাম। নিশ্চয়ই ভূত ওটা; নইলে রামনাম শুনে পালাবে কেন? তাই না রে?

—হতে পারে; বলল বিশু—অবশ্য রাক্ষস হতেও মানা নেই।

ভূত! রাক্ষস! বিড়বিড় করল নিতাই। মলয় যেমন বর্ণনা দিল তাতে করে রাক্ষস বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য এ পর্যন্ত যতগুলো ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েছে সে, তারমধ্যে এমন মাথাঅলা মানুষের বর্ণনা নেই কোথাও। তবে পাশের বাড়ির লাট্টুদা অবশ্য মাসখানেক আগে একবার বলেছিল এমন মাথাঅলা মানুষের কথা। মিলিটারীতে চাকরী করে লাট্টুদা। হিমালয়ের কোথায় যেন একবার যুদ্ধের সময় দেখা পেয়েছিল হঠাৎ। লাট্টুদা অবশ্য রাক্ষসই বলেছিল মাথাটাকে। হঠাৎ শিউরে উঠল নিতাই, মলয়ের বর্ণনা করা বস্তুটা যদি রাক্ষসই হয়—তবে তো আর রক্ষে নেই। কাঁচাই হয়তো চিবিয়ে খাবে ওদের সব ক'জনকে। আর ওর-ও ডিটেকটিভগিরীর তাহলে এখানেই শেষ।

—কি রে নিতে, অমন ভাবে চেয়ে আছিস কেন? হলটা কি? মলয়ের প্রশ্নে অপ্রস্তুত ভাবে শুকনো হেসে বলল নিতাই,—হয় নি কিছুই, তবে ভাবছি রহস্য ক্রমেই যেন জটিল হয়ে উঠছে।

—হোক্, হাই তুলে বলল বিশু—এখন ফেরা যাক চল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

—তাই চল বরং; সমর্থন জানালো নিতাই—বিকেলে বরং শিবমন্দিরের দিকে যাব একবার।

ঘরমুখো পথ ধরল তিনজনে।

জঙ্গলের সীমানা শেষ হয়েছে অনেকটা আগেই। এখন আর ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো বড় বড় সব গাছপালা নেই কোথাও। চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে শীতের

মিঠে রোদ্দুর পোয়াচ্ছে যেন। খানিকটা এগুবার পরই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নিতাই। চাপা গলায় বলল—ঐ বাঁকটার দিকে চেয়ে ছাখ্—কে যেন আসছে এদিকে।

চোখের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে ভুরু কুঁচকে তাকালো মলয়। পরক্ষণেই বলল—হ্যাঁ, চিনেছি—হরিদাস চন্দ।

—ও, সে-ই লোকটা! নাক সিঁটকে বলল বিশু—বড্ড বদমেজাজী লোক, কথা বলব না আমরা।

অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন হরিদাসবাবু। ওদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরে চোখ থেকে গোল ফ্রেমের চশমাটা খুলে নিয়ে গর্জে উঠলেন নাঁকি গলায়—নকুড়ের ভাগনেটার ঐ বাউণ্ডুলে বন্ধুগুলো না?

মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সকলে। ইস্, কথার কি ছিরি! উত্তর দেবে কে? গলার স্বর শুনলেই যেন জ্বলে ওঠে মাথার ভেতরটা।

—হলটা কি ছোঁড়ারা? বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন হরিদাসবাবু—সব বোবা হয়ে গেলি নাকি একসঙ্গে?

নাঃ, আর সহ্য করা চলে না, যা ইচ্ছে তাই বলে চলেছেন ভদ্রলোক। সময় থাকতে শুধরে দেওয়া দরকার। এদিক ভেবেই দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলল বিশু—বোবা হব কেন? এই তো কথা বলছি।

হাতের চশমাটা চোখে পরে নিয়ে একটু সময় তাকিয়ে রইলেন হরিদাসবাবু। বললেন তারপর—বা-বা, বেশ টঁ্যাসট্যাসে কথা শিখেছিস দেখছি। তা, ওদিকে সব কোথায় গিয়েছিলি র‍্যাঁ?

উত্তরে বিশু কিছু বলার আগেই কথা কেড়ে নিয়ে বলল নিতাই—যাই নি কোথাও, ঘুরে ঘুরে দেখছি জায়গাটা।

—হুঁঃ; নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক একটা ধ্বনি নির্গত করে ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন হরিদাসবাবু—কথা কি! ঘুরে ঘুরে দেখছি

জায়গাটা! যত্তোসব আদিখ্যেতা। এসব পছন্দ করি নে একদম; যা যা পালা সব; বাড়ি যা শীগগির—।

কথাগুলো দ্রুত শেষ করেই হন্‌হন্‌ করে হাঁটা দিলেন হরিদাস-বাবু। আর, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইল ওরা তিনজন। ভদ্রলোক বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে পরে বিশুর হাতে আলতো চিমটি কেটে বলল মলয়—কি মেজাজ দেখলি! ইচ্ছেমত গালাগাল করে গেল আমাদের!

—ঠিক বলেছিস; সায় দিল বিশু—বড্ড অভদ্র ভদ্রলোক, কি এমন খারাপ কথা বলেছি আমরা? তুই কি বলিস নিতে?

ঘাড় ফিরিয়ে নিতাই এর দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল দু'জনে। একটু তফাতে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে কি যেন পরীক্ষা করছে নিতাই।

—কিরে নিতে? কাছে এল মলয়; বলল—কি দেখছিস?

—জুতোর ছাপ।

—কার জুতোর ছাপ? কই, দেখি? এগিয়ে এল বিশু।

ঘাড় ফেরালো নিতাই; তারপর অদ্ভুত ধরনের একফালি হেসে বলল—হরিদাসবাবুর জুতোর ছাপ। এই ছ্যাখ্‌।

মাথা হেঁট করে নির্দিষ্ট জায়গাটুকুর দিকে চোখ রাখতেই যেন বিদ্যুতের শক্‌ খেল বিশু। মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল প্রবল এক উত্তেজনার চাপে। গোল গোল চোখে নিতাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল কোনমতে—এ তো সেই ক্রেপসোল জুতোর খাঁজকাটা ছাপ দেখছি! উত্তরে মৃদু হাসলো নিতাই।

—হলফ্‌ করে এখন বলা যায়; প্রায় চেঁচিয়ে বলল বিশু—হরিদাস চন্দ হলেন শত্রুপক্ষের লোক; তাই নারে?

বই-এর ডিটেকটিভদের মত অল্প একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো নিতাই। তারপর "বনের কান্না" বই-এর পুলিশ ইন্সপেক্টর অমিত কুমারের ছোট্ট দু'টি কথা উল্লেখ করে বলল—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। কি

বুঝলো কে জানে ; কয়েক মুহূর্ত নিতাই-এর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল বিশু—এতক্ষণে বুঝলাম, লোকটা কেন এত বদমেজাজী।



বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে বারোটা হয়ে গেল। ছোট্ট বারান্দাটায় ব্যস্ত ভাবে পায়চারী করছিলেন নকুড়মামা ; ওদের দেখে বললেন—এই যে, সব গিয়েছিলি কোথায় ? এদিকে আমি তো ভেবে মরি।

—ঐ জঙ্গলটার কাছে ফাঁকা মাঠটাতে বসে গল্প করছিলাম আমরা। দ্রুত বলল নিতাই।

—তা বেশ ; কিন্তু দেখিস, জঙ্গলের ভেতর যাসনে যেন ; সাপ খোপ থাকতে পারে—। যাকগে, বেলা হল অনেক, স্নান টান সেরে খাওয়া দাওয়া সেরে নে তাড়াতাড়ি। আমায় আবার বেরুতে হবে এক্ষুনি। কলতলার দিকে হেঁটে গেলেন নকুড় মামা।

—কিন্তু···পল্টু কোথায় ? জিজ্ঞাসা করল মলয়।

—হ্যাঁ···ওকে আবার অমিতের বাড়ি পাঠিয়েছি একটু আগে ; এখুনি আসবে।

ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো মলয় আর বিশু ; আর একা দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভেবে চলল নিতাই। বিশেষ একটা দরকারে নিশ্চয়ই পল্টুকে অমিতবাবুর ওখানে পাঠিয়েছেন নকুড় মামা। কিন্তু কথাটা যেন মেনে নেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। গোটা সকালটাই তো অমিতবাবুর বাড়িতে ছিল পল্টু ; তাহলে পরে কথাটা তখন না

বলে এত বেলায় ওকে আবার ওখানে পাঠাবার অর্থটাই বা কি? সত্যিই কি কোন জরুরী কাজ রয়েছে নকুড় মামার? নাকি কোন একটা ছুতো করে পল্টুকে এখান থেকে অন্ততঃ কিছুটা সময়ের জন্য সরিয়ে রাখলেন নকুড় মামা? এই সম্ভাবনাটিই হয়তো সত্য হতে পারে। হয়তো বা এমন কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন নকুড় মামা, যার কোন সাক্ষী রাখতে চান না তিনি। কিন্তু, কি সেই কাজ?

—ও দাদাবাবু, একা একা দেঁইড়ে ভাবছডাকি অত? নকুড় মামার রাঁধুনে বামুন রামলালের প্রশ্নে চমকে উঠল নিতাই। থতমত খেয়ে বলল—এ্যাঁ? ও, এমনি দাঁড়িয়ে আছি; স্নান করব এবার।

—এখানকার জল কিন্তুক খুব স্বাস্থ্যকর; পানের দাগধরা দাঁতগুলো বের করে বলল রামলাল—বেড়াতে এইছ যখন, পেটডা পুরে খাওয়া দাওয়া লও—ঘুম লাগাও; দেখবা এই মোটা পালোয়ান বইনে গেছ দু-ডা দিনে। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়; রামলালের দিকে চোখ রেখে ভাবলো নিতাই। সত্যিই, পালোয়ানের মতই চেহারা বটে ওর। ইয়া মোটা তেল চকচকে শরীর। মস্ত বড় বুকের ছাতি, হাত পায়ের গুলি। এক নজরেই বোঝা যায়, শরীরে হাতির মত শক্তি রাখে রামলাল।

—তা দাদাবাবু, আজ গেইছিলা কোথা?

—ঐ তো ঐ জঙ্গলের ধারে ফাঁকা মাঠটা আছে না? ওখানে বসে গল্প টল্প করছিলাম।

—তা ভালো। কিন্তুক শোন দাদাবাবু, নতুন এইছ তোমরা। একডা কথা কইয়ে রাখি···এটুকু বলেই গলার স্বরটা হঠাৎ খাদে নামিয়ে এনে বলল রামলাল—খবদ্দার! ঐ জঙ্গলের মধ্যে ভুলেও যেও নি যেন!

—কেন? কি হবে গেলে? কি আছে ওখানে? তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো নিতাই।

—ওমা, এডা কইলাডা কি? জয় রামজী! কপালে একবার

হাতটা ঠেকিয়ে নিয়ে বলল রামলাল—শোন, ভূত আছেন জঙ্গলে ; বেহ্মদত্যির কথা জান তো ? সেই বেহ্মদত্তি থাকেন ওখানে।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল নিতাই—যাঃ, ব্রহ্মদৈত্য আবার আছে নাকি ?

—ছি ছি ; জিব কাটলো রামলাল ; বলল—আর কক্ষনো কইও না এমন কথা ; পাপ হবেক তোমার। এখানকার অনেক মানুষ দেখেছেন তেনাকে।

—তা, তুমি দেখেছ কখনও ?

—জয় রামজী একডা দিন দেখা দিছেন বটেক। আগে স্নান খাওয়াডা সেইরে নাও ঝট করে। পরে কইব সে কথা।



পল্টু ফিরলো আরো ঘণ্টা দেড়েক পর। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে ডিটেকটিভ বই খুলে বসেছে নিতাই। বিশু আর মলয় ঘুমুচ্ছে ভোঁস ভোঁস করে।

পল্টুকে দেখে হাতের বইটা বিছানায় রেখে উঠে বসল নিতাই। বলল—কোন খবর আছে নাকি রে ? অমিতবাবুর ওখানে সন্দেহজনক কিছু দেখলি ?

একটু সময় ভেবে নিল পল্টু। বলল—আজ সকালে মোট তিনজন দেখা করতে এসেছিল অমিতবাবুর সঙ্গে। এঁদের মধ্যে দুজনকে আমি চিনি। হরিদাস চন্দ আর নির্মল সোম। কিন্তু তৃতীয় জনকে চিনি না।

—এ্যাঁ ? হরিদাসবাবু গিয়েছিলেন ? উত্তেজিত ভাবে বলল নিতাই।

—হ্যাঁ, প্রায় আটটা নাগাদ। টিটোর সঙ্গে ক্যারম খেলছিলাম তখন। কি সব জমি টমি নিয়ে কথা বললেন কতক্ষণ। তারপর যখন উঠি উঠি করছেন, ঠিক তখনই এলেন নির্মল সোম।

—তারপর ? কি কি কথা বললেন ভদ্রলোক ?

—সব কথা ঠিক শুনতে পাই নি। মাথা চুলকে বলল পল্টু—তবে দুয়েকটা অবশ্য কানে এসেছে, যেমন "দিন কয়েক ধরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে," "বাজারের থলিটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ"···এমন সব আর কি। প্রায় দশ পনের মিনিট মত গল্পগুজব করে চলে গেলেন ওঁরা।

—একই সঙ্গে গেলেন দু'জনে ?

—হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছি জানালা দিয়ে।

—হুঁ ; বেরুলেন একসঙ্গে, অথচ জঙ্গলের দিকে একা গেলেন হরিদাস চন্দ ! অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করল নিতাই।

—কিছু বললি ? জিজ্ঞাসা করল পল্টু।

—না। তারপর বল্, আরেকজন কে এসেছিল বলছিলি ?

—ও, হ্যাঁ ; আরেকটা লোক এসেছিল। খুব লম্বা আর মোটা। ধুতি পরা গায়ে লংকোট। উলের বাঁদর টুপী দেখেছিস তো ? সেইরকম টুপী মাথাতে থাকায় মুখ দেখতে পাইনি ভালোমত। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই। গলার স্বরেই চিনে নিতে পারব লোকটাকে। কেমন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ; সর্দি কাশি হয়ে গলা বসে গেলে যেমন হয়, ঠিক ওরকম।

—হুঁ। গম্ভীর মুখে বলল নিতাই—তা, লোকটা কি নিয়ে কথা বলল ?

—বারান্দায় বসে যে কি সব ফিসফাস করল, তার একটা বর্ণও বুঝি নি। বার দুয়েক ক্যারমের ঘুটি হারাবার ছল করে বারান্দায়ও

গিয়েছিলাম ; কিন্তু আমাকে দেখেই একেবারে চুপ। কথাটি পর্যন্ত নেই কারোর মুখে।

—বুঝলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নিতাই—বোঝা যাচ্ছে ওঁর কথাগুলো ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু, লোকটা কে হতে পারে ?

—আচ্ছা নিতে, সেটা তো টিটোকে জিজ্ঞাসা করেই জানা যায়, তাই না ?

—তা অবশ্য জানা যায়, তবে কাজটা ঠিক হবে না। কারণ, অমিতবাবুর ছেলে বলে টিটোও "সন্দেহজনক ব্যক্তি"দের একজন, বুঝেছিস ?

—তাহলে ? লোকটার পরিচয় জানবি কি করে ?

—উপায় বের করতে হবে। সংক্ষিপ্ত জবাব নিতাই-এর।



বেলা চারটার মধ্যেই শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা চারজন। আগের দিনের চাইতে ঠাণ্ডার দাপট আজ যেন আরো বেশি। গোটা আকাশ মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি অবশ্য হচ্ছে না—তবে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সোঁ সোঁ শব্দে। দাঁতে দাঁত লেগে যেতে চাইছে ঠাণ্ডার কামড়ে।

—ঐ ছাখ্, নিত্যলালবাবু আসছেন। গলায় মাফলারটা ভালো করে পেঁচিয়ে নিয়ে বলল বিশু। নিত্যলালবাবুকে অবশ্য আগেই দেখেছে ওরা। হাসিমারা স্টেশনের কাছে স্টেশনারী দোকান আছে ভদ্রলোকের। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। মাথা ভর্তি

টাক ; তবে ঠোঁটের ওপর কালো কুঁচকুচে গোঁফের ঘন জঙ্গল। গলার স্বরটা যেন কেমন সরু সরু। মেয়েদের মত অনেকটা। কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন নিত্যলালবাবু। ওদের দেখেই বললেন —কি গো, সবাই মিলে বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি ? বেশ, বেশ।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলেন ভদ্রলোক।

আরো মিনিট কয়েক হাঁটার পর শিবমন্দিরে এলো ওরা। নকুড় মামা ঠিকই বলেছিলেন। বড্ড সুন্দর মন্দিরটা, দেখবার মতই বটে। গোটা মন্দিরটার আকৃতি মস্ত একখানা শিবলিঙ্গের মত। একধারে ওপরে উঠবার সিঁড়ি। ঠিক এপাশেই আবার নানান গাছপালায় ঢাকা একফালি জমি।

ওপরে উঠে এল সকলে। সবে দরজা খুলেছে মন্দিরের। সন্ধ্যারতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন পুরোহিত ঠাকুর। জনা কয়েক স্থানীয় মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে বারান্দা জুড়ে।

বেশ খানিকক্ষণ এধারে ওধারে ঘোরাঘুরির পর বলল নিতাই— চল্ এবার, ঐ লাল বাড়িটাতে যেতে হবে একবার।

—জঙ্গলে যাবি ? চল্ তাহলে। উৎসাহজনক ভঙ্গিতে বলল বিশু। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে থাকলো সকলে।

—ঐ ছাখ্ নিতে। নিতাই-এর হাতে আলতো চিমটি কেটে ফিসিফিসিয়ে বলল পল্টু।

তাকালো নিতাই। অরূপ দত্ত আসছেন। সঙ্গে বাঁদর টুপী পরা মোটামত একজন লোক। হাত নেড়ে কি সব যেন বলছে লোকটা।

—আজ সকালের সেই লোকটা। বলল পল্টু।

—কে, ঐ লোকটা ? বলল বিশু—ওকে তো দেখেছি আজ দুপুর বেলায়।

—সুবল সাহা, বলল মলয়—সোনার দোকানের মালিক, আজ দুপুরে তোরা যখন ঘুমুচ্ছিলি, নকুড় মামার কাছে এসেছিল।

—তাই নাকি ? ভুরু কুঁচকালো নিতাই। তারপর বলল—ঐ ছ্যাখ্, অরূপ দত্তের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে বোধ হয়। চল্, ওদিক দিয়ে ঘুরে ঐ ঝোপটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। শুনতে পাব তাহলে।

পা টিপে টিপে ঝোপটার ভেতরে এসে গুঁড়িসুড়ি মেরে দাঁড়ালো সকলে। সুবল সাহার গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। চড়া গলায় বলছেন ভদ্রলোক—না না, আর অপেক্ষা করতে পারব না বলে দিলাম, জিনিস নিলে পয়সা দিতেই হবে। দেব না বললে তো চলবে না।

প্রত্যুত্তরে অরূপ দত্তের অসহায় কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—পয়সা দেব না তো বলি নি। তবে প্লীজ, আর দু'টো দিন সবুর কর। একেবারে পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেব।

—রাবিশ্! চেঁচিয়ে উঠলেন সুবল সাহা—রোজই তো এমন কথা বলছ। মুশকিলের ব্যাপার! আমরাও তো ব্যবসা করতে বসেছি!

—সত্যি, আর মাত্র দু'টো দিন, কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব। তা, কাল পাচ্ছি তো ?

সুবল সাহার প্রত্যুত্তর ঠিক শোনা গেল না। তবে অরূপ দত্তের কণ্ঠস্বর ভেসে এল কানে—ঠিক আছে, ঐ কথাই রইল। চলি তাহলে ?

জুতোর মশ্‌মশ্ শব্দ তুলে চলে গেলেন অরূপ দত্ত। আরো মিনিট দুই একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবল সাহা। চোখ কুঁচকে হাতঘড়ি দেখলেন একবার। তারপর হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করলেন উল্টোদিকের পথ ধরে। প্রায় সাথে সাথেই এক লাফে ঝোপের বাইরে এলো নিতাই। তারপর উবু হয়ে কুড়িয়ে নিল কি যেন মাটি থেকে।

—কি রে ? বলল মলয়।

—চিনতে পারছিস ? হাতের জিনিসটা গম্ভীর মুখে তুলে ধরল নিতাই। ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল মলয়। কাঁপা গলায় বলল—একি ! সেই রজনীগন্ধা ফুল ! কোত্থেকে এল ?

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে বই-এর ডিটেকটিভরা কোন্ মুখভঙ্গিতে কথা বলে, দ্রুত ভেবে নিয়ে বলল নিতাই—রজনীগন্ধা ফুলটা সুবল সাহার হাতেই ছিল প্রথম থেকে।

—তার মানে···সেদিন তাহলে···। বিশুর কথার মাঝেই বাধা দিল নিতাই—আরো অবশ্য লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। মাটির দিকে চেয়ে গ্যাখ্।

দ্রুত চোখ ফেরালো সকলে। নরম মাটির ওপর ভেসে থাকা খাঁজ কাটা জুতোর ছাপগুলো নজরে আসছে পরিষ্কার।

—এ যে দেখছি সে-ই জুতোর ছাপ ! অস্ফুট গলায় বলল মলয়।

—ঠিকই ধরেছিস ; মৃদু হেসে বলল নিতাই—আর ঐ জুতো ছিল সুবল বাবুর পায়ে।

—সুবল বাবুর ! বড় বড় চোখে বলল বিশু—রজনীগন্ধা ফুল, জুতোর ছাপ—সবই যখন মিলে যাচ্ছে···তাহলে···নিতে···ওকে তো এখুনি গ্রেপ্তার করতে পারি আমরা ?

ঘাড় নাড়লো নিতাই। তারপর 'শকুনের কান্না' বই-এর ডিটেকটিভের কথা উল্লেখ করে বলল—না, তা পারি না। অত অল্প প্রমাণে কেস্ কোর্টে ওঠালে ধোপে টিকবে না। হাতে নাতে গ্রেপ্তার করতে হবে ওকে।

মুখ 'হা' করে 'কেস্' 'কোর্ট' শব্দগুলো উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল মলয়। সায় দিয়ে বলল—ঠিকই বলেছিস ; রজনীগন্ধা ফুল কোর্টে না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কেস্ তাহলে উঠবে কেমন করে ?

—যাকগে, পরে ওসব ভাবা যাবে ; বলল পল্টু—ঐ লাল বাড়িটায় বরং চল্ এখন ; অন্ধকার হয়ে এলো।

শুকনো রজনীগন্ধা ফুলটা পকেটে ভরে বলল নিতাই—তাই-ই চল্ এখন। বেলা থাকতে বাড়িটায় যাওয়া দরকার।



জঙ্গলে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় পড়ে এল শীতের ছোট্ট বিকেলখানা। আসন্ন সন্ধ্যার কালচে আঁধারগুলো সবে মাত্র উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে এদিক ওদিক। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসের দল সন্‌সন্ শব্দে বয়ে চলেছে দ্বিগুণ উৎসাহে। হুর-হার করে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে নাম-না-জানা সব বড় বড় গাছের ডালপালাগুলো।

ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ; জঙ্গলের শীতল নিস্তব্ধতা ভেদ করে ছোট্ট শিশুর কান্না ভেসে এল হঠাৎ। আঁৎকে উঠে চোখ বন্ধ করল নিতাই।

—বাচ্চার কান্না! শুনছিস! ফিসফিস করল বিশু।

—কিন্তু, এই জঙ্গলে অতটুকু একটা বাচ্চা এল কি করে? ভীতকণ্ঠে বলল পল্টু।

—শব্দটা যেন ওদিক থেকেই আসছে; বলল বিশু—যাই, দেখে আসি।

—খবরদার! বাধা দিল মলয়—যাসনে; মনে হচ্ছে রাক্ষসটারই গলা ওটা।

—ধেৎ, রাক্ষসের গলা এতটুকু বাচ্চার মত হয় নাকি!

ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ! কান্নার শব্দ ভেসে এল আবার।

—আমি সিওর ; কাঁপা গলায় বলল মলয়—রাক্ষসটাই হবে ওটা।

—বুঝলি কি করে ? এতক্ষণে বলল নিতাই।

—বুঝেছি ; ঐ রাক্ষসটা বাচ্চার গলা নকল করে ভোলাতে চাইছে আমাদের। গিয়েছ কি মরেছ ; গপাগপ গিলে খাবে। কথাটা অবশ্য মনে ধরল সকলের। সমর্থন জানিয়ে বলল পল্টু—চল্ তাহলে, ফিরে যাই।

—ইস্, ফিরে যাই ! ভেংচে বলল বিশু—মোটেই না ; আগে দেখব, তারপর যাব। চল্ তো নিতে—। একরকম জোর করেই নিতাইকে নিয়ে চলল বিশু। বড় বড় চোখে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল পল্টু আর মলয়। আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই ডানার ঝট্‌পট্ শব্দ ভেসে এল হাত কয়েক দূরবর্তী পাকুড় গাছটার একেবারে মগ্ ডাল থেকে। নিতাইকে ছেড়ে চকিতে ঘাড় উঁচু করে ওপর দিকে তাকালো বিশু। এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিকে নড়াচাড়া করছে লম্বা লম্বা ডালপালাগুলো।—শীগগির পালিয়ে আয় ! চেঁচিয়ে বলল মলয়—ঐ রাক্ষসটাই বোধহয় নাড়াচ্ছে ডালপালাগুলো !

উত্তরে বিশু কিছু বলবার আগেই হুট্‌হাট শব্দে লম্বা লম্বা ডানা মেলে জঙ্গলের বিপরীত দিকে উড়ে গেল একপাল শকুন। একটু সময় তাকিয়ে দেখলো বিশু ; তারপর হো হো শব্দে হেসে বলে উঠল—শকুনগুলো গাছের ডালেই তাহলে ছিল এতক্ষণ !

'শকুন' কথাটা শুনেই যেন ধড়ে এতক্ষণে প্রাণ ফিরে পেল নিতাই। সম্ভ পড়া 'শকুনের কান্না' বইটার কথা মনে পড়ল এবার। শকুনের বাচ্চার কান্না অবিকল মানুষের বাচ্চার মত। দূর থেকে শুনলে পরে বুঝবার জো নেই কার কণ্ঠস্বর। ইস্, কথাটা একটু আগে মনে পড়লেও অবাক করে দেওয়া যেতো সকলকে। অথচ—।

—ও হরি, ওটা তাহলে শকুনের বাচ্চার কান্না! হেসে বলল পল্টু। ঘাড় ফেরালো নিতাই; সামান্য বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল—এতক্ষণে বুঝলি নাকি? আমি তো প্রথমেই বুঝেছিলাম; তবে বাচ্চাটা কেন কাঁদছে, এটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। যাকগে, সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এল, তাড়াতাড়ি পা চালা সকলে।



বেশ কিছুটা পথ এখন এগিয়ে আসছে ওরা। জঙ্গলের গভীরতা এখানে তুলনামূলকভাবে অনেকটা বেশি। সেই লাল বাড়িটা এখনো খানিকটা দূরে; আরো মিনিট ৫।৭ মত পথ হাঁটতে হবে ওখানে পৌঁছুতে হলে।

মাঝারী আকারের একটা বুনো ঝোপের কাছাকাছি এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল পল্টু। ধরা গলায় বলল—এই, আর গেলে বাড়ি ফিরতে পারব না কিন্তু।

—ফিরে যাবি? অনেকটা যেন ঝিমুনো গলায় বলল বিশু।

—তাই চল্ বরং; বলল পল্টু—কাল সকালে না হয় আসব আরেকবার। কি বলিস নিতে?

নিতাই মুখ খুলবার আগেই আসন্ন সন্ধ্যার ম্যাড়ম্যাড়ে আলোমাখা জঙ্গলের শীতল নিস্তব্ধতা ভেদ করে কানে ভেসে এল "ক্যা-হুয়া, ক্যা-হুয়া" শব্দে একপাল শেয়ালের ভীতিকর চীৎকার। খুব কাছে, যেন ঝোপের আড়ালেই, রয়েছে শেয়ালগুলো। বড় বড় চোখের ভয়ার্ত চাউনি মেলে ঝোপটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে

চেয়ে রইল চার চারটে মাথা। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে যেন কথা বলবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

ওদিকে শন্‌শন্‌ শব্দে বয়ে চলেছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস। প্রবল ঠাণ্ডার দাপটে হাত-পাগুলো যেন জমে ভারী হয়ে উঠতে চাইছে বরফের মত।

—ঐ ছ্যাখ্‌। ঝোপটা যেন নড়ে উঠলো হঠাৎ। বিশুর কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল সকলে। সত্যিই, এখান থেকে প্রায় হাত দশেক মত দূরের মানুষ সমান উঁচু গাছপালা যেন হঠাৎ হেলে পড়ল এ ওর গায়ে। যেন কেউ হেঁটে চলেছে ওদিক দিয়ে। আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে কিছু বলবার আগেই চুপ করে গেল মলয়। কানে ভেসে এল এক ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর; কাকে যেন উদ্দেশ করে বলছে—হ্যাঁ, হিসেব নিকেশ মিটিয়ে রাখাই ভালো। আমি যা চাই, তা পেলেই মুখ বন্ধ করে রাখব।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রত্যুত্তরে—আর যদি না দিই? কি করবে তাহলে?

—না দিলে? না দিলে অবশ্য অসুবিধায় পড়তে হবে তোমাকে। মনে রেখো, তোমার পরিচয় কিন্তু আমার কাছে আর গোপন নেই এখন।

—বেশ; এরপর তাহলে কি করতে চাও তুমি?

ফ্যাসফ্যাসে গলার হাসি শোনা গেল এবার। হাসতে হাসতেই বলল লোকটা—এরপর কি করতে চাই তা-ও কি বলে দিতে হবে? পুলিশ স্টেশন এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় জান বোধহয়?

—ও, পুলিশে জানাবে তাহলে। একটু কাল চুপ করে থাকবার পর বলল গম্ভীর কণ্ঠস্বরে—বেশ; কত টাকা পেলে মুখ বন্ধ করবে তুমি?

—কত টাকা? শোন, তুমি হলে আমার চেনাজানা লোক;

খুব বেশি চাইব না তাই। হাজার পঞ্চাশেক পেলেই সব কিছু ভুলে যেতে রাজী আছি আমি।

—প-ঞ্চা-শ হাজার! জঙ্গল কাঁপিয়ে শোনা গেল এক গম্‌গমে অট্টহাসি। প্রায় মিনিটখানেক এক নাগাড়ে হাসলো লোকটা। শেষে হাসি থামিয়ে বলল—মাত্র পঞ্চাশ হাজার? ভে-রী গু-ড্। এই নাও তাহলে, এখনই দিচ্ছি তোমাকে।

পিস্তলের পিলে চমকানো শব্দে হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল মলয় আর পল্টু। আঁৎকে উঠে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো নিতাই; কোনমতে শক্ত করে ধরে রইল বিশু। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে ভেসে এল এক করুণ আর্তনাদ আ-আ-আ। 'ঝুপ্' করে ভারী কিছু যেন আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল চারজন। ভাঙ্গা গলার লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানকার গাছপালাগুলো এখন পর্যন্ত নড়ছে এলোমেলোভাবে। হয়তো বা মাটিতে পড়ে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ছে লোকটা। মিনিটখানেক কি দু'য়েক চলল এভাবে। তারপর সব চুপচাপ—নিস্তব্ধ। জঙ্গলের সন্ধ্যার অন্ধকার মাখা হাড় কাঁপানো নিস্তব্ধতাটুকু এসে জায়গা দখল করল ঠিক আগেকার মত।

—বুঝলি বন্দুকের গুলিতে বোধহয় মরে গেল লোকটা। কাঁপা গলায় বলল বিশু।

—ওরে বাব্-বাঃ! শীগগির পালিয়ে যাই চল্! চাপা আর্তনাদ করল পল্টু।

—সেই ভালো; ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো মলয়—খুনীটা দেখতে পেলে কিন্তু আমাদেরও গুলী ছুঁড়ে মারবে।

—চল্ নিতে, মলয়ের কথা যেন কানেই যায় নি এমন ভঙ্গিতে বলল বিশু—ঝোপটার ভেতর গিয়ে দেখে আসি চল্?

কথাটায় হঠাৎ শিউরে উঠলেও নিজেকে দ্রুত সামলে নিল নিতাই। না, ভয় পাওয়া চলবে না কোনমতে; ডিটেকটিভ হতে

হলে যে কত ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করতে হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে সব ক'টি গোয়েন্দা গল্পের বইতে। এদিক ভেবেই বিশুর কথা সমর্থন করে ঘাড় নাড়ল নিতাই এবং পরক্ষণেই ঝোপ লক্ষ্য করে এগুল দু'জনে।

এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গাঢ় হয়ে ওঠে নি সন্ধ্যার অন্ধকার। আবছা ধরনের এক বেলাশেষের কালচে আলোর আবরণে ঢাকা গোটা জঙ্গল। আবছা হয়ে উঠেছে আশপাশের গাছপালা-পথঘাট, সবকিছু।

—উঃ, কি কাঁটাগাছ! সার্টের হাতায় আটকে পড়া শুকনো একটা গাছের ডাল খুলতে খুলতে বলল নিতাই।

বিশুর অবশ্য কোন নজরই নেই ওদিকে। গোল গোল চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল—কই কোথাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

—তাই তো···, তাহলে পরে কি··· ; বাকি কথাগুলো অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল নিতাই—বিশু···ঐ দ্যাখ্!

চকিতে ঘাড় ফিরিয়েই আর্তনাদ করে উঠল বিশু—আরে ব্বাস! কে ওটা! সেই লোকটা নাকি?

শুকনো কাঁটাঝোপের একধারে পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। শেষ বিকেলের মুমূর্ষু আলোতেও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল মৃত সুবলবাবুকে। মাথায় উলের তৈরি সেই বাঁদর টুপী। ধুতি আর কোটপরা দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে হাত পা ছড়িয়ে। গুলী লেগেছে বাঁ দিকের বুকে। রক্তে একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে কোটটা; ক্ষতস্থান থেকে এখন পর্যন্ত রক্ত ঝরছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

—উঃ! দু'হাতে চোখ চাপা দিল নিতাই। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের শীতল নিস্তব্ধতাটুকু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে

"ক্যা-হুয়া" "ক্যা-হুয়া" শব্দে শোনা গেল একপাল শেয়ালের সেই বীভৎস আর্তনাদ।

শিউরে উঠল নিতাই। পণ্টুর কথামত এই শেয়ালডাকের পরই সেদিন গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছিল অমানুষিক সেই মাথাটা। এদিকে, অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে ক্রমেই। ঠিক পায়ের কাছেই পড়ে আছে সুবলবাবুর রক্তাক্ত মৃতদেহ। দ্রুতলয়ে কথাগুলো ভাবতেই বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে কেঁপে উঠল। মনে পড়ে গেল "কালোমেঘের জাগরণ" বই-এর ডিটেকটিভ অমৃত সিং এর কথাগুলো—"হত্যাকাণ্ডের পর দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে লুকিয়ে থেকেই পরবর্তী পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চায় হত্যাকারী।"

—বিশু, চল পালিয়ে যাই; চাপা গলায় বলল নিতাই—যে লোকটা গুলী ছুঁড়েছে, হয়তো ধারে কাছেই লুকিয়ে আছে। দেখতে পেলে কিন্তু··· ; বাকি কথাগুলো আর শেষ করা গেল না। মস্‌মস্ শব্দে হঠাৎ নড়ে উঠল হাত দশেক দূরের ঘন গাছপালাগুলো। কেউ যেন চলাফেরা করছে ওদিকে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। কিন্তু, ও-কি! ও কে উঁকি দিয়ে আছে গাছপালার আড়াল থেকে!

প্রবল এক ভীতিকর শিহরণে থরথর করে কেঁপে উঠল দু'জনে। অপলক চোখে অমানুষিক মাথাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কেবল। কি ভয়াবহ সেই চেহারা! গোটা মুখটাই যেন বীভৎসতার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। নীচের পাটির ঠোঁটটা হা হয়ে ঝুলে আছে নীচের দিকে; দু দিকের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে টকটকে কাঁচা রক্ত। আর, বন্যজন্তুর মত বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়েছে দুপাশের গজদন্ত। গোল গোল চোখ দু'টোর চাউনি হিমের মত ঠাণ্ডা—অপলক। স্থির ভাবে যেন চেয়ে রয়েছে ওদেরই দিকে।

পা টিপে কয়েক পা পিছু সরে এল বিশু ; ফিসফিস করে বলল— নিতে, পালিয়ে আয়।

কিন্তু পালাবে কি করে নিতাই। প্রবল ভয়ের চাপে পা দু'টো যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে বড্ড। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে কেবল। কিন্তু তবুও পালাতে তাকে হবেই। দেহের সবটা শক্তি একত্রিত করে পৈশাচিক সেই মুণ্ডটার দিকে দৃষ্টি রেখে পিছু সরতে লাগলো নিতাই। মুণ্ডটা কিন্তু স্থির ভাবে চেয়ে রইল কেবল। নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আর সেই সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পড়ি মরি করে দৌড় মারলো দু'জনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখন ঘন। অনেকটা হালকাও হয়ে এসেছে, আকাশের বুকে জমে থাকা মেঘেদের একটু আগেকার সেই কঠিন আবরণ। ফিকে আলোর ছটা ঠিকরে বেরুচ্ছে গোটা আকাশ থেকে। হয়তো চাঁদ উঠবে এখনই।

অনেকটা পথ একনাগাড়ে ছুটবার পর জঙ্গল-সীমানার প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো দু'জনে। আর পারা যাচ্ছে না। একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। প্রবল পরিশ্রমে যেন হাঁপরের মত ওঠা নামা করছে বুকের হাড়-পাঁজড়াগুলো। গরম লাগছে বেজায়। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে কপালে। গায়ের গেঞ্জিখানাও ভিজে জবজবে।

—চল্, হেঁটে হেঁটে যাই এবার, লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল বিশু— আর দৌড়ব না।

মুখ হা করে অনেকটা বাতাস নিয়ে বলল নিতাই—দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নি। হাঁফ ধরেছে বড্ড।

আচম্বিতে ঠিক বিপরীত দিক থেকে ভেসে এল রক্ত জল-করা সেই অট্টহাসি—হা-হা-হা।

ঝটিতে ঘাড় ফেরালো দু'জনে। সদ্য মেঘভাসা চাঁদের নরম আলোতেও স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল আজ সকালেই লালবাড়িতে দেখা

সেই পাগলটাকে। একই ভঙ্গিতে হাতের লাঠিটা বন্দুকের মত তুলে রেখেছে ওদেরই দিকে। ভয়ের ওপর ভয়। হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। এক পা পিছু সরতে চাইছিল বিশু—

—হল্ট। গর্জে উঠল লোকটা—তোমরা ইধর হোয়াট ডুইং।

দাঁতে দাঁত চেপে রইল দু'জনে। একটি শব্দও উচ্চারণ করা চলবে না।

পয়লা নম্বরের 'সন্দেহজনক ব্যক্তি' বলে মনে হচ্ছে লোকটাকে।

—হোয়াট। কিউ সাইলেন্ট? হাতের লাঠিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ক্যাচ লুফলো লোকটা। বলল—না বললে হামলোক উইল ফায়ার তোমাদের। রেডী, ওয়ান-টু···।

"থ্রী" বলবার আগেই নড়েচড়ে দাঁড়ালো নিতাই। ভীতকণ্ঠে বলল—রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

—ক্যাঁয়া? নাকি গলায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। হাতের লাঠিটা জঙ্গলের দিকে তাক্ করে কি যেন দেখল খানিকক্ষণ, তারপর উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ—হামলোক আণ্ডার স্ট্যাণ্ড। তোমরা ডাকু হায়। তোমাদের সার্চ করেগা হাম্। বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে এল লোকটা।

—স্পীক্! ইধর হোয়াট ডুইং তোমরা!

—খু··খুন হয়েছে ওখানে···উঃ কি রক্ত! বিশুর মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ।

—হোয়াট! খুন—মার্ডার! কিধর? তুমলোগ ডাকু আছ, খুনী আছে···বলতে বলতেই বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে বিশুর ডান হাতটা হঠাৎ খপ্ করে চেপে ধরল লোকটা।

তবে, সাহস আছে বটে বিশুর। গায়ের জোরও কম নয়। আড় চোখে তাকিয়ে মনে মনে প্রশংসা করল নিতাই। লোকটা হাত চেপে ধরা মাত্রই প্রচণ্ড একটা ঝট্‌কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই দ্রুত কয়েক পা পিছু সরে গেল বিশু। তারপর 'নিতে, পালিয়ে

আয়' বলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুট মারলো মিস্‌মিসে কালো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকা সব গাছপালাগুলোর ভেতর দিয়ে। পলায়মান বিশুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর 'হি হি' শব্দে হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়ালো নিতাই-এর দিকে। অসহায়ের মত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল নিতাই। ভেসে আসা এক টুকরো কালো আবরণে এখন ঢাকা পড়েছে একটু আগেকার সোনারঙা গোল চাঁদ। কুচকুচে কালো আঁধারের ছোঁয়ায় ঝিমঝিম করছে গোটা জঙ্গল। যদ্দূর দু'চোখের দৃষ্টি যায় কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার।

আর, তারই মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগুতে থাকলো কালিঝুলি মাখা বীভৎস চেহারার লোকটা।



নিতাই ফিরলো আরো আধঘণ্টাখানেক পর। সবে সন্ধ্যে সাতটা হলে কি হবে, চারদিকে এমন ঘুরঘুট্টে অন্ধকার, মনে হয় যেন গভীর রাত্রি এখন। দূর থেকেই দেখলো নিতাই, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে রামলালকে কি সব যেন বলছে বিশু। পল্টু আর মলয় পাশেই দাঁড়ানো। যাক, ওরাও তাহলে ফিরেছে। কিন্তু, অতসব কি কথা বলছে বিশু? রামলালকে খুন-টুনের কথাগুলো বলে দিল নাকি? বিরক্ত হল নিতাই। অতসব বলার দরকারটাই বা কি? রামলাল শত্রুপক্ষের লোক কি না কে জানে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কাছে এল নিতাই।

—এই তো, তুই এসেছিস তাহলে? উত্তেজিতভাবে বলল বিশু ঐ পাগলটা এমনি এমনিই ছেড়ে দিল তোকে?

ইস্, সব ম্যাসাকার করে দিল বিশুটা! সবকিছুই তাহলে বলে দিয়েছে রামলালকে। যাকগে, যা বলেছে বলুক। তার বেশি আর একটি বর্ণও জানানো যাবে না ওকে। এদিক ভেবেই বলল নিতাই ছেড়ে দেবে কেন? এমনিই তো চলে গেল।

—এ্যাঁ? এমনিই চইলে গ্যালেন? বলল রামলাল—কিচ্ছুডা কইলেন না তোমারে?

—না, কিচ্ছু বলে নি।

—নতুন এইছেন এখানডায়। কাঁধের গামছায় ঠোঁটের কষদুটো মুছে নিয়ে বলল রামলাল—আমারে দ্যাখা দ্যান নাই এখনও।

—দেখ নি ভালো। বলল বিশু—দেখলে ভয় পেতে; ঠিক রাক্ষসের মতন।

—রাক্ষস! জয় রামজী। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল রামলাল—তা, গেইলেন কোন্ দিক্‌ডায় দেখছ নাকি দাদাবাবু?

রামলালের প্রশ্নে সতর্ক হল নিতাই। খুব একটা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না ওর প্রশ্নের গতিবিধি। খুটিয়ে জানতে চাইছে সবকিছু। কাজেই দায়সারা গোছের জবাবে বলল সে—কোন্ দিকে গেল কে জানে। যা ঘুটঘুটে অন্ধকার? দেখা যায় নাকি কিছু!

—যাকগা বাবা, আর ভেইবে কাজডা নাই। নাও, মুখ হাতডা ধুইয়া লও ঝট্‌পট্। পরোডা আর মুরগীর মাংস করছি আইজ। খেইয়ে লও গরম গরম।

রান্না ঘরে ঢুকলো রামলাল। আর কলতলার দিকে এগুলো ওরা চারজনে।

খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হয়েছে সবে, নকুড় মামা ফিরলেন এমন সময়। সঙ্গে নিত্যলাল বাবু। মেয়েদের মত সরু গলাতে

বলছিলেন ভদ্রলোক—এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার নকুড়! সুবল বাবুকে অমন করে মারলো কে?

কান খাড়া করে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো নিতাই। বারান্দায় উঠে এসেছিলেন নকুড় মামা। নিত্যলাল বাবুকে বেতের চেয়ারটায় বসতে বলে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। তারপর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন নিজে। ওদিকের দরজা দিয়ে বারান্দায় এসেছিলো পল্টু।

—কিরে, আর সব কোথায়? ওকে দেখে বললেন নকুড় মামা।

—ঘরে আছে। লুডো খেলছে।

—হ্যাঁ, এখন দিন কয়েক ঘরেই থাকবে তোমরা। বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি কোরো র না কিন্তু।

—আর। ঐ জঙ্গলের দিকে যেন ভুলেও যেও না। বললেন নিত্যলাল বাবু। বাইরে বেরিয়ে এসেছিল নিতাইও।

বলল—জঙ্গলে একবারও যাইনি আমরা।

—বেশ বেশ, খুব ভালো কথা। শোন নি বোধহয়, বিকেলের দিকে একজন খুন হয়েছে ওখানে।

চা নিয়ে এসেছিল রামলাল। নিত্যলাল বাবুর কথাগুলো কানে যেতেই শিউরে উঠে বলল—রামজী! এডা কি কইলেন বাবু! বিকেলে খুন হইছেন? কোন্ মানুষডা বাবু?

—তাকে তুমি চিনবে না। বললেন নকুড় মামা—আর শোন রামলাল, এ নিয়ে কিন্তু বেশি বলাবলি কোরো না। পুলিশের কানে গেলে কিন্তু ঝামেলার একশেষ করে ছাড়বে।

বোকা বোকা মুখে একটু সময় তাকিয়ে রইল রামলাল। পরে কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল—ও বাবা, পুলিশও এইছেন নাকি। এই জয় রামজী কইলাম। কাউরে কইব না এ কথাডা।

আরো দু'চার কথার পরে ঘরে চলে এল পল্টু আর নিতাই। লুডো খেলায় মশগুল বিশু আর মলয়। পল্টু স্থান নিল ওদের পাশে। আর টিটোর কাছ থেকে আনা ডিটেকটিভ বইটা নিয়ে দরজার ধারে মেঝেতে বসল নিতাই। এখান থেকে পরিষ্কার শোনা যাবে নকুড় মামাদের কথাবার্তা। ঠিক এই মুহূর্তে, ওদের কথার প্রতিটি অক্ষরই হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বলছিলেন নিত্যলাল বাবু—আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন! ইস্, আজ বিকেলেই শিবমন্দিরের ওদিকে দেখলাম ওঁকে! তখন কি আর জানতাম যে এমনি করে মরবেন।

—তুমি না জানলেও, আমার ধারণায় সুবল বাবু অবশ্যই কিছু না কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। বললেন নকুড় মামা।

—হতে পারে হয়তো। দশরকম ব্যবসা থাকবার পরিণতি তো এমনই হয়। মনে হয় চেনা জানা কেউই মেরেছে ওঁকে।

—এদিকের সম্ভাবনাই বেশি। অনেকেই তো বাকিতে জিনিসপত্র নিতেন ওঁর থেকে। কাউকে হয়তো টাকার তাগাদা দিয়েছিলেন···

—ইয়েস! কথার মাঝেই মেয়েলী গলায় চেঁচিয়ে বললেন নিত্যলাল বাবু—টাকা দিতে পারবে না এমন লোকই হয়তো মেরেছে ওঁকে।

—কিন্তু, কে সেই লোক? ওঁর থেকে তো মালপত্র নিতেন প্রায় সকলেই। ভুরু কুঁচকে নকুড় মামা বললেন—তুমি আমিও কিন্তু বাদ পড়ছি না।

—এ্যাঁ! সে তো মাত্র দু'বার নিয়েছি আমি। তা বলে আমি খুন করতে যাব কেন? তোমার কি মনে হয় নকুড়? আমি কি খুন করতে পারি?

—আমার মনে হওয়া দিয়ে তো চলবে না। বললেন নকুড় মামা—পুলিশ বিশ্বাস করলেই হল।

হরিদাস চন্দের গলা শোনা গেল বাইরে থেকে। লাল একটা

ফুল সোয়েটার পরেছেন ভদ্রলোক। কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে এই বেশে।

—এই যে নিত্যলালও আছ দেখছি। বারান্দায় উঠে এসে একেবারে বাঁ দিকের চেয়ারে বসে বললেন—হরিদাস বাবু, শুনেছ নিশ্চয়ই দুর্ঘটনার কথা ?

—হ্যাঁ, গম্ভীর গলায় নকুড় মামা বললেন—আশ্চর্য ! এমনি করে খুন হলেন ! খ্যাঁচ খ্যাঁচ শব্দে হাসলেন হরিদাস বাবু। বললেন—কুকর্মের ফল তো এমনই হয়।

—কুকর্ম ? কি কুকর্ম বল তো ?

—কেন, জান না কিছু ? কি নাকি এক খাবার ওষুধ দিতেন ভদ্রলোক। ঐ জন্যেই তো চব্বিশটি ঘণ্টা ওঁর পিছু ঘুর ঘুর করত সকলে। আমাদের অরূপ দত্তও তো ঐ ওষুধ নিত বলে শুনেছিলাম।

—খাবার ওষুধ ? চোখ কুঁচকে নিত্যলাল বাবু বললেন—কি সেই ওষুধ ? আবার সেই আগের মত হাসলেন হরিদাস বাবু। বললেন—তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন হে নিত্যলাল ? তুমিও তো বাপু সেই ওষুধ নিতে।

—আমি ! দেখ হরিদাস, যা-তা বললে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি ওষুধ নিতাম, কে বলেছে তোমাকে ? এ্যাঁ ?

—কে আবার বলবে ? ঠিক জায়গা থেকেই শুনেছি। তা ওষুধ না হয় নিতেই, এমন চটে উঠবার কি আছে তাতে ?

—স্টপ ননসেন্স ! একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন নিত্যলাল বাবু—তুমি বড্ড বেড়ে উঠেছ দেখছি। যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াচ্ছ আমার নামে ! বেশ, আমিও দেখে নেব তোমাকে। পুলিশের কাছে বলব তোমার নামে। আচ্ছা আমি চলি নকুড়। এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে হন্‌হন্ করে গেটের বাইরে চলে গেলেন নিত্যলাল বাবু।

—দেখলে তো নকুড়, কাণ্ডটা দেখলে? চড়া গলায় বললেন হরিদাস বাবু—সত্যি কথা বলাই বিপদ। কেমন যা তা বলে গেল।

—কিন্তু হরিদাস, ওষুধের কথা তুমি জানলে কি করে? জিজ্ঞাসা করলেন নকুড় মামা—কি ওষুধ ওটা?

—অতশত জানি না। তবে খেলে নেশা হয় নাকি শুনেছি। পোস্টমাস্টার নিমাই বাবু বলেছিল আমাকে।

—নিমাইও ওষুধ নিত নাকি!

—ওমা, তুমি দেখছি কিছুই জান না!

—কিন্তু হরিদাস, সুবল বাবুই বা এতসব ওষুধ যোগাড় করতেন কোত্থেকে?

—কে জানে। ঠোঁট উল্টিয়ে হরিদাস বাবু বসলেন—অত খবর জানি নে আমি। যাকগে, চলি এখন? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। তারপর বারান্দা থেকে এক পা নেমেই যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বললেন—ও হ্যাঁ, একটা বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল আমার ওখানে!

—কি ব্যাপার? কৌতূহলী চোখে তাকালেন নকুড় মামা।

—আমার ঐ কালো রঙের কোটটা দেখেছ না?

—হ্যাঁ ঐটেই তো সবসময় পরতে তুমি। তা, হয়েছে কি?

—কোটটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না গত পরশু থেকে। বলা নেই কওয়া নেই, বেমালুম হাওয়া জিনিসটা।

—সে কি! তারপর? আর পেলেই না?

—পেয়েছি। কতকটা চিন্তান্বিত গলায় বললেন হরিদাস বাবু—কোথায় পেয়েছি জান? কলতলার পাশে যে পেয়ারা গাছটা আছে—আজ বিকেলের দিকে পেয়ারা আনতে গিয়ে দেখি গাছটার পেছন দিকের একটা ডালে ঝুলছে কোটটা। কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে অমন করে।

—আশ্চর্য! তারপর?

—তারপর আর কি? নিয়ে এলাম গাছ থেকে। এমনিতে অবশ্য যেমন তেমনই আছে। তবে মাঝের একটা বোতাম নেই দেখলাম। আশ্চর্য! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

আরো গুটি কয় কথার পর বিদায় নিলেন হরিদাস বাবু। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন নকুড় মামা, সেই সুযোগে বারান্দায় এল নিতাই। কেমন যেন অদ্ভুত এক ওষুধ ওষুধ গন্ধ মেশানো বাইরের বাতাসে। নাক টেনে দু'বার শ্বাস নিল নিতাই। বড্ড চেনা অথচ অচেনা বলে মনে হচ্ছে গন্ধটা। কি ওষুধের গন্ধ? এল কোত্থেকে? চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকালো নিতাই।

কিন্তু…ও কি! কে-ও!! ঝাঁকড়া বকুল গাছটার দিকে চোখ যেতেই যেন ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল নিতাই। গাছতলার অন্ধকারে মিশে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?

ঠিক এই মুহূর্তে অবশ্য তেমন একটা ভয়ের ভাব অনুভব করল না নিতাই। একে আলো জ্বলছে বাইরে, তার ওপর গেটের ওখানে দাঁড়িয়ে হরিদাসবাবুর সঙ্গে তখন পর্যন্ত কথা বলে চলেছেন নকুড় মামা। কাজেই নিশ্চিন্তে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে ব্যাপারটার। বারান্দা থেকে নেমে পায়ে পায়ে বকুল গাছটার কাছে এল নিতাই। ওর পদশব্দই হয়তো বা কানে গিয়ে থাকবে লোকটার। বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এল সে গাছতলা থেকে; হাতে বাজারের একখানা থলি।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করল নিতাই—রামলাল… তুমি! সাদা সাদা দাঁতগুলো বের করে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে বলল রামলাল—আর কইবডা কি দাদাবাবু, বাজারের থলিডা কুকুরে ফেইলছেন এখানে।

অপলক চোখে চেয়ে রইল নিতাই। তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হচ্ছে না কথাগুলো। অথচ বুঝতে দেওয়া চলবে না ওকে।

সতর্ক হয়ে পড়বে তাহলে। এদিক ভেবেই বলল নিতাই—হ্যাঁ, কুকুরগুলো পাজী হয় ভীষণ ; জিনিসপত্র টানাটানি করে কেবল।

—আর কও ক্যান্। যাও, ঘরে যাও দাদাবাবু, হিম পড়ছেন··· ঠাণ্ডায় ধরবেন······, বলতে বলতে রান্নাঘরে চলে গেল রামলাল। গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে অবাক হল নিতাই, অমন খাপছাড়া ভাবে মাটিতে পাগুলো ফেলছে কেন রামলাল? পায়ে কি কোন চোট পেয়েছে? অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও তো হাঁটছিল স্বাভাবিক ভাবে! তবে?

—কি হয়েছেরে নিতে? হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে বারান্দায় এসে বললেন নকুড়মামা—এই ঠাণ্ডায় ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—ক্যারমের ঘুঁটিটা পড়ে গেল হঠাৎ, তাই খুঁজছি ; আসল কথাগুলো এড়িয়ে গিয়ে মাথা চুলকে কোনমতে বলল নিতাই।

—ও আর খুঁজে লাভ নেই এখন ; সকালে দেখিস বরং, যা ঘরে যা। দ্রুত ঘরে ঢুকলেন নকুড় মামা। পায়ে পায়ে বারান্দার দিকে এল নিতাই। ওষুধের সেই গন্ধটা যেন এখানেও টের পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। তবে কি···তবে কি নকুড় মামার শরীর থেকেই ভেসে আসছে এমন গন্ধ? তার মানে···তাহলে পরে নকুড় মামাই কি ব্যবহার করেছেন এমন গন্ধযুক্ত ওষুধ? কিন্তু, কি সেই ওষুধ?



রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মাথা পর্যন্ত লেপে ঢাকা দিয়ে আজকের কথাগুলোই ভাবছিল নিতাই। পাশেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে বিশু মলয় আর পল্টু। খুনের কথাটাই মাথায় খেলে যাচ্ছে বার বার। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে যেটুকু কথা কানে এসেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে হত্যাকারী সুবলবাবুর পরিচিত। নইলে পরে তাকে লক্ষ্য করেই বা সুবলবাবু বলবেন কেন "তোমার আসল পরিচয় কিন্তু প্রকাশ হয়ে গিয়েছে আমার কাছে ?"

"আসল পরিচয়" কথাটার অর্থ কি ? তাহলে নিশ্চয়ই হত্যাকারীর একটা নকল পরিচয়ও আছে এবং সেই পরিচয়েতেই ঘুরে বেড়ায় সে। আর সুবলবাবুও জানেন সেই নকল পরিচয়খানা। এ পর্যন্ত ভাবতেই হঠাৎ একটা কথা নিতাই-এর মাথায় খেলে গেল। হ্যাঁ, সুবলবাবু সে সময়ে 'তুমি' 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন লোকটাকে। এখন প্রশ্ন হল, কাকে কাকে তিনি 'তুমি' বলতেন ? অমিতবাবুকে বলতেন—টিটো বলেছে। অরূপ দত্তকে বলতেন—ঝোপের আড়াল থেকে শুনেছে নিজের কানে। নকুড় মামাকেও বলতেন—পল্টু বলেছে। কিন্তু···ভাবনা থামালো নিতাই। আর ভেবে কাজ নেই। কারণ হরিদাসবাবু, নিত্যলালবাবু আর নির্মল সোমকে কি বলতেন—তা জানে না ও। কোন সময় কথাও বলতে দেখে নি ওঁদের সঙ্গে। ভাবনার মোড় ঘুরিয়ে নিত্যলালবাবুর কথায় এল নিতাই। হরিদাসবাবুর কথামত সুবলবাবুর থেকে ওষুধ

নিতেন ভদ্রলোক। কিন্তু কথাটা বলাতে অমন ঝট্ করে চটেই বা উঠলেন কেন? এটা অবশ্য ভাবা দরকার।

নেশা হয় নাকি ওষুধটা খেলে—হরিদাসবাবু বলেছিলেন। কিন্তু, কেমন গন্ধ সেই ওষুধের? নকুড় মামার শরীর থেকেও একটা ওষুধের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল; ওটা কি সেই নেশা করবার ওষুধ? তার মানে নকুড় মামাও কি নেশা করেন? কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রায় শ-দুয়েক ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়ে নেশার ব্যাপারে যেটুকু জেনেছে সে, তাতে করে ব্যাপারটা যেন মেনে নেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। কারণ, নেশা যারা করে তাদের চোখ দুটো হয় লাল লাল, কথা জড়িয়ে যায়—টলে টলে পড়ে পা দু'টো। অথচ, নকুড় মামার সঙ্গে কোনটাই মিলছে না। কিন্তু···রামলালের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। হ্যাঁ, এইবারে মিলেছে; নেশা করেছিল রামলাল। পরিষ্কার দেখেছিল সে, চলে যাবার সময় কেমন যেন বেখাপ্পাভাবে পা দু'টো মাটিতে ফেলছিলো রামলাল; তা ছাড়া চোখ দুটোও ছিল করমচা-লাল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে একটা। রামলাল যদি নেশা করে থাকে, তাহলে নকুড় মামার শরীরে অমন ওষুধ ওষুধ গন্ধ এল কি করে? একজন নেশা করলে অন্য জনের শরীরে সেই গন্ধ আসা কি স্বাভাবিক? কে জানে, হতেও পারে! এ ব্যাপারে বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই নিতাই-এর। অতএব ভাবা চলল না আর। মাঝপথেই ভাবনা শেষ করে হরিদাসবাবু সম্পর্কে ভাবতে চাইল নিতাই। বেশ কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ওঁর বিষয়ে। নম্বর দিয়ে ভেবে চলল নিতাই।

এক, সুবলবাবু যে খুন হলেন একথা কার কাছে শুনলেন তিনি?

দুই, নিত্যলাল বাবু, অরূপবাবু আর নিমাইবাবু যে সুবলবাবুর থেকে ওষুধ নিতেন এ কথা তিনি কি করে জানলেন?

তিন, ওষুধ খেলে নেশা হয় বলেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি নিজে কি এই ওষুধ খেয়েছেন।

চার, কোটটা হারাবার ব্যাপারে তিনি যা বললেন, তা কি সত্যি ?

পাঁচ, রাগের মাথায় নিত্যলালবাবু বলেছিলেন যে তিনি হরিদাসবাবুর কথা পুলিশকে জানাবেন। কি সেই কথাগুলো ?

না, আর ভাবা চলছে না। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে চাইছে সব। মন থেকে সবরকমের ভাবনা সরিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ঘুমুবার চেষ্টা করল নিতাই এবং ঘুমিয়েও পড়ল এক সময়।

ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন সকাল হয়ে গেছে। পায়ের দিকের জানালাটা দিয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়েছে একফালি সূর্যকিরণ। বিশু, মলয় আর পল্টু কেউ ঘরে নেই। বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। বিছানা ছেড়ে বাইরে এল নিতাই। প্রভাতী সূর্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করছে বাগানের গাছপালাগুলো। দূরে আকাশের বুকে আবছা দেখা যাচ্ছে কুয়াশা ঘেরা এক অচেনা পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো নিতাই। কি একটা যেন পাহাড়ের কথা বলেছিলেন নকুড় মামা, এটা কি সেই পাহাড় ? কে জানে !

—এই যে দাদাবাবু, ঘুমডা ভাইঙ্গলেন ? রামলালের কণ্ঠস্বরে ঘাড় ফেরালো নিতাই। বলছিল রামলাল—যাও দেখিন্…ঝটপড মুখহাতডা ধুইয়া লও ; আলুর চপ বানাইছি—। খেইয়ে লও গরম গরম।

—যাচ্ছি ; হাই তুলল নিতাই ; তারপর গায়ের চাদরটা ভালোমত জড়িয়ে নিয়ে এল কলতলায়।



খাওয়া দাওয়ার পর লালবাড়িটার ওখান থেকে মলয়ের সংগ্রহ করা বট পাতার মোড়কটা খুলে বসল নিতাই। ভেতরে আছে একখানা টর্চের ব্যাটারি, শুকনো রজনীগন্ধা ফুল আর ফিল্টার সিগারেটের গোটা কয়েক পোড়া অংশ। রজনীগন্ধা ফুলের ওপর অবশ্য এখন আর তেমন গুরুত্ব দিল না নিতাই। কারণ মৃত সুবল-বাবুর হাতেই ফুলটা দেখেছে সে। দ্বিতীয় হল ব্যাটারি। জিনিসটা ওখানে পড়ে ছিল কেন? নিশ্চয়ই ফেলে গিয়েছিল কেউ। কিন্তু, কেন? তা ছাড়া···, বাকিটা ভাববার আগেই কানে এল নকুড় মামার গলা। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছেন। জিনিসগুলো দ্রুত পকেটে ভরে বাইরে এল নিতাই। নির্মল সোম আর একজন অচেনা ভদ্রলোক আছেন নকুড় মামার সঙ্গে। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা ভদ্রলোকের। ফুলপ্যাণ্ট আর কোট পরা। মিস্‌মিসে কালো গায়ের রঙ। পুরু মোটা ঠোঁট দুটো। মাথায় ঘন কালো গোছা গোছা চুল। লোকটাকে উদ্দেশ করেই বলছিলেন নকুড় মামা—বল কি হে নিমাই, গত রাতেই তোমার ওখানে হানা দিয়েছে পুলিশ?

বুঝল নিতাই, এই লোকটাই নিমাইবাবু। এখানকার পোস্ট-মাস্টার। দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

—আর বল কেন; বলছিলেন নিমাইবাবু—রাতের খাওয়া সেরে শুতে যাব, পুলিস এল এমন সময়।

—তা, কি বলল তোমাকে ? জিজ্ঞাসা করলেন নির্মলবাবু।

—সে কি আর একটা প্রশ্ন ! রাশি রাশি প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে চলল। যেমন—সুবল বাবুকে আমি কবে থেকে চিনি ; কার কার বাড়ি যেতেন তিনি ; মাসে পোস্ট অফিসে আসতেন ক'দিন ; গতকাল দুপুরে কখন এসেছিলেন—এমনিধারা হাজারো প্রশ্ন।

—গতকাল পোস্ট অফিসে গিয়েছিলেন নাকি ; জিজ্ঞাসা করলেন নকুড় মামা।

—সে তো প্রায়ই আসতেন ; কলকাতায় নাকি কিছু খদ্দের ছিল ওঁর। ওঁদেরই মাল পাঠাতেন রেজিস্টার্ড পার্সেলে।

—কি থাকতো পার্সেলে ? জান ? বললেন নির্মল বাবু।

—অত জানি না ; তবে বেশ ভারি প্যাকেটগুলো—শক্ত শক্ত। গয়নার বাক্স টাক্স হবে বোধহয়।

—সেই ওষুধগুলোও হতে পারে। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন নকুড় মামা।

—ওষুধ ? বিস্মিতভাবে বললেন নির্মল বাবু—কিসের ওষুধ হে নকুড় ?

—কেন, তুমি জান না ? অবশ্য আমিও জানতুম না ; হরিদাস এসেছিল গতকাল ; ও-ই বলল কি নাকি নেশা করবার ওষুধ বিক্রি করতেন সুবল বাবু।

—নেশা করবার ওষুধ ? নিমাই বাবুর কথায় আড় চোখে তাকিয়ে বললেন নকুড় মামা—তুমিও তো ঐ ওষুধ নিতে ?

—আমি ? ছাই এর মত ফ্যাকাসে মুখে তাকালেন নিমাই বাবু।

—হ্যাঁ, হরিদাস তো সে কথাই বলল।

—ও, হরিদাস বলেছে ! হেসে বললেন নিমাই বাবু—ব্যাটা বদ্ধ পাগল। ঠাট্টা করে বলেছিলাম একবার যে ওষুধটা খেয়ে দেখতে হবে একবার, আর, সেটাই সত্যি বলে ভেবে বসেছে ও !

—তাহলে খাওনি তুমি ? বললেন নির্মল সোম।

—ক্ষেপেছ নাকি ! ঐ ওষুধ খেতে যাব কেন আমি ?

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সিগারেট টানলেন নকুড় মামা। পরে বললেন—সুবল বাবুর মৃত্যু সম্পর্কে পুলিশ কি বলছে ? কাউকে সন্দেহ করছে নাকি ওরা ?

—না, তেমন বিছু বলে নি পুলিশ।

—সবই ভাগ্য, বুঝলে হে সবই ভাগ্য ; নইলে কি আর অমন জলজ্যান্ত মানুষটা ওভাবে মরে ! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন নির্মল বাবু।

—চললে নাকি ?

—হ্যাঁ চলি ; কিছু কাজ আছে আবার। ভালো কথা নকুড়, তুমি আসবে নাকি ? কি একটা খাতা নাকি আমার ওখানে ফেলে এসেছিলে বলছিলে ?

—ওঃ হো, একদম খেয়াল ছিল না ! আচ্ছা, আমি বরং বেলার দিকে নিতাইদের কাউকে পাঠিয়ে দেব তোমার ওখানে।

—বেশ, চলি তাহলে।

কিন্তু, যাওয়া আর হল না। তার আগেই গেট খুলে হন্তদন্ত ভাবে ছুটে এলেন অমিত বাবু। দরজার ফুটো দিয়ে নিতাই দেখল, বেশ বড় বড় শ্বাস ফেলে হাঁফাচ্ছেন ভদ্রলোক।

—ব্যাপার কি হে ? অমন করে ছুটে আসছ কেন ? কেউ তাড়া করেছে নাকি ? হেসে বললেন নিমাই বাবু।

বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন অমিত বাবু। তারপর হাতের লাঠিটা দরজার পাশে রেখে বললেন—তাড়া আবার কে করবে ? এ পথেই যাচ্ছিলুম, ভাবলুম খবরটা দিয়ে যাই নকুড়কে। ছিঃ, এসবের মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি মোটেই পছন্দ করিনে আমি।

—কি হয়েছে শুনি ? বললেন নির্মল বাবু।

—বলছি ; কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন অমিত বাবু—

ঘণ্টাখানেক আগে পুলিশ এসেছিল আমার ওখানে। ঐ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আর কি? জান, দুটো মারাত্মক কথা শুনলাম ওদের কাছে।

—মারাত্মক কথা? কি কি কথা বল তো? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নকুড় মামা।

—বলছি; এক নম্বর হল সুবল বাবু নাকি স্মাগলিং গ্যাং-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ্যাঁ!! ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠে বললেন নির্মল বাবু—সে কি! তা কি করে হবে!

—কি করে হবে নয়, তাই-ই হয়েছে নির্মল। বাঁকা পথে নানা ধরনের চোরাই মাল আমদানী রপ্তানী করতেন সুবল বাবু। আর তার প্রমাণও নাকি যোগাড় করেছে পুলিশ।

—কি আশ্চর্য! তাহলে সেই ওষুধগুলোও চোরাই মাল নাকি? দ্রুতকণ্ঠে বললেন নিমাই বাবু।

—কে জানে; হতে পারে হয়তো। তবে, পুলিশ অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু বলে নি। ওদের ধারণায় ঐ স্মাগলিং দলের কেউই হত্যা করেছে ওঁকে।

—কিন্তু অমিত, ওষুধগুলো যদি চোরাইমালই হয় তবে কোত্থেকে এগুলো যোগাড় করতেন সুবল বাবু? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দিয়ে যেতো ওঁকে; তাই না? কথার মাঝেই প্রশ্ন করলেন নকুড় মামা।

—সে তো বটেই; আর এই নিয়েই তো খোঁজ খবর করছে পুলিশ। যাকগে, এবার শোন দ্বিতীয় কথাটা। এটা কিন্তু আরো মারাত্মক; আর তোমাকেই এ ব্যাপারে কিন্তু নজর রাখতে হবে নকুড়।

—আমাকে? চোখ কুঁচকে তাকালেন নকুড় মামা—কেন, আমি কি করেছি?

—তুমি নয়; তোমার ঐ ভাগ্নে আর তার বন্ধুগুলোর সম্পর্কেই বলছি।

—মানে···নিতাই ওদের সম্পর্কে? কেন? ওরা কি করেছে?

দরজার আড়ালে থেকেও কথাটা শুনেই ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল নিতাই। নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু নজরে এসেছে পুলিশের, নতুবা কেউ না কেউ থানায় গিয়ে নালিশ জানিয়েছে ওদের নামে। বিশু ওরা কি তাহলে বেফাঁস কিছু বলে বসেছে এদিক সেদিকে!

বলছিলেন অমিত বাবু—পুলিশ ইন্সপেক্টর সত্যেন বাবু বললেন তোমার ঐ ভাগনে আর তার বন্ধুগুলোকে নাকি জঙ্গলের একেবারে ভেতরে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে।

—বল কি অমিত! আর্তস্বরে বললেন নকুড় মামা—ঐ গভীর জঙ্গলে আমরাই ঢুকতে সাহস পাই না—তা ওরা ঢুকবে কি করে?

—তা জানি না; তবে সত্যেন বাবু তো আর মিথ্যে বলেন নি। নিশ্চয়ই দেখেছেন ওদের।

—সে কি! বললেন নিমাই বাবু—ছেলেগুলোর সাহস তো কম নয়! জঙ্গলের ভেতর ঘোরাফেরা করে!

—শুধু ঘোরাফেরা করলেও না হয় একটা কথা ছিল নিমাই; কিন্তু পুলিস ইন্সপেক্টর কি বলেছেন লক্ষ্য কর; বলেছেন ওরা নাকি 'সন্দেহজনক' ভাবে ঘোরাফেরা করছিল।

—সে আবার কেমন ঘোরাফেরা কে জানে! অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করলেন নির্মল বাবু।

—হুঁ; তাহলে সত্যেন বাবু এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ওদেরই সন্দেহ করছেন! হতাশ কণ্ঠে এ পর্যন্ত বলেই টেবিলে দু'কনুই-এর ভার রেখে কিছু সময় গালে হাত রেখে মাথা হেঁট করে রইলেন নকুড় মামা। ঐ অবস্থাতেই কেমন যেন ধরা গলাতে বললেন—এখন যদি এই খুনের ব্যাপারে ওদের গ্রেপ্তার করে, তাহলে কি করব আমি? কি জবাব দেব ওদের বাড়িতে?

পুলিশের কথা শুনে হিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিতাই। সত্যি সত্যিই যদি সুবলবাবুর হত্যাকারী হিসাবে এখন গ্রেপ্তার করে বসে পুলিশ, তাহলে তো রক্ষে নেই আর। নির্ঘাৎ ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কে ঠেকাবে!

—তুমি অযথাই অমন ঘাবড়ে পড়ছ নকুড়; নিমাই বাবুর গলায় সম্বিৎ পেল নিতাই। বলছিলেন ভদ্রলোক—সত্যেন বাবু তো আর গ্রেপ্তার করবেন বলেন নি; সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন কেবল—এইটুকুই হল তাঁর কথা।

—হ্যাঁ, গ্রেপ্তারের অবশ্য কোন কথা আসছে না। সমর্থন জানিয়ে বললেন অমিত বাবু—তবে ওদের বরং জঙ্গলের দিকে যেতে ভালো করে নিষেধ করে দিও নকুড়, বুঝলে?

—তাই-ই বলে দেব। ঘাড় নাড়লেন নকুড় মামা।

—আর শোন, সত্যেন বাবু যদি তোমার কাছে আসেনও, খুব ভেবে চিন্তে জবাব দেবে কিন্তু। বলবে, ওরা তো নতুন এসেছে এখানে, তাই না বুঝে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, এটা বলাই ভালো; বললেন নির্মল বাবু।

—আর ওদিকে যাওয়াই বা কেন রে বাপু? উঠে দাঁড়িয়ে অমিত বাবু বললেন—এসব মোটেই পছন্দ করিনে আমি। যাক, আমি তাহলে চলি এখন।

—চল, আমরাও যাব; উঠলেন নির্মল বাবু আর নিমাই বাবু।

বিদায় নিলেন সকলে। একটু সময় বসে রইলেন নকুড় মামা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। দ্রুত সরে গিয়ে ডিটেকটিভ বইটা হাতে নিয়ে বিছানায় উপুড় হল নিতাই। নকুড় মামা ঘরে ঢুকলেন একটু পরেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল পল্টু, মলয় আর বিশুও।

এই যে তোরাও এসেছিস? ভালোই হয়েছে—শোন্, একটা কথা জানা দরকার তোদের। গম্ভীর গলায় বললেন নকুড় মামা।

উদগ্রীব চোখে চেয়ে রইল সকলে।

—শুনেছিস নিশ্চয়ই, একটা খুন হয়েছে এখানে।

—হ্যাঁ, রামলাল বলেছে; পল্টুরা কিছু বলবার আগেই দ্রুত গলায় বলল নিতাই।

—বেশ, শুনেছিস তাহলে। শোন, অমিত এসেছিল একটু আগে। ওর মুখেই শুনলাম এই খুনের ব্যাপারে পুলিশ নাকি তোদেরই সন্দেহ করছে। গ্রেপ্তার করতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

—এঁ্যা! গ্রেপ্তার করবে! আঁৎকে উঠে বিশু বলল—কি করেছি আমরা?

—গত দু'দিন ধরে তোদের নাকি জঙ্গলের ভেতর সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে পুলিশ।

—কিন্তু নকুড় মামা, আমরা তো ওদিকে বেশি দূর যাই নি! কেবল ঐ 'খু'—; 'খুন' কথাটার 'খু' পর্যন্ত বলতেই নিতাই-এর চিমটিতে সচকিত হয়ে উঠল মলয়। ইস্! আর একটু হলে খুনের কথাটা বলেই দিচ্ছিল নকুড় মামাকে! খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে নিতাই। চিমটি কেটে নিজেই বলতে শুরু করেছে—সে তো মাত্র একবার জঙ্গলে গিয়েছিলাম আমরা। তা-ও তো বেশিদূর যাই নি!

—কি জানি বাপু, বিরক্তিমাখা গলায় নকুড় মামা বললেন—তোরা বলছিস বেশিদূর যাস নি; অথচ ইন্সপেক্টর দু'দিন গভীর জঙ্গলে দেখলো তোদের! ভৌতিক ব্যাপার নাকি? একটু থেমে আবার বললেন তিনি—আজ থেকে কিন্তু ওদিকে মোটেই যাবি না বলে দিচ্ছি। বেড়াতে হয় অন্য দিকে যা-না বাবা, কে বারণ করেছে?

—ঠিক আছে, আর যাব না আমরা। বলল নিতাই।

—এই তো ভালোছেলের কথা; হেসে বললেন নকুড় মামা—বুঝিস তো পুলিশ যখন একবার সন্দেহ করতে শুরু করেছে, যতটা সাবধানে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। আমি চলি তাহলে। দরজা

পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলেন নকুড় মামা ; পল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন—শোন্ পল্টু, খানিকক্ষণ বাদে নির্মলের বাড়ি যাস্ তো একবার। অফিসের একটা খাতা ফেলে এসেছি। তোর হাতে দিয়ে দেবে নির্মল।

বড় বড় পায়ে দরজার বাইরে চলে গেলেন নকুড় মামা।



আধঘণ্টার মধ্যেই নির্মল সোমের বাড়িতে পৌঁছে গেল পল্টু আর নিতাই। নকুড় মামার কথামত পল্টু অবশ্য একাই আসতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হয় নি নিতাই। 'কবরের আর্তনাদ' বই-এর ডিটেকটিভ হুকুম চাঁদের কথা উল্লেখ করে বুঝিয়েছে যে তদন্তকার্যে প্রতিটি খুঁটিনাটি পদক্ষেপেও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ডিটেকটিভদের। এরপর অবশ্য আর আপত্তি জানায় নি পল্টু। কুইনাইন গেলা মুখে সম্মতি জানিয়ে বলেছে—বেশ, চল তাহলে।

নির্মল সোমের বাড়ি ঢুকে সিঁড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিতাই। ওর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংলগ্ন জমির দিকে, সিঁড়ির বাঁ ধার ঘেঁষে পড়ে আছে ফিল্টার সিগারেটের গোটা কয়েক পোড়া অংশ। উবু হয়ে বসে পোড়া টুকরোগুলো একে একে কুড়িয়ে নিল নিতাই।

—কিরে? এগিয়ে এল পল্টু।

—পরে বলব। সংক্ষিপ্ত জবাব নিতাই-এর।

সিঁড়ি ধরে উঠে এল দু'জনে। জানে পল্টু, একেবারে শেষের ঘরটা হল বসবার ঘর।

কিন্তু ও-কি! কুকুরের ডাক ভেসে আসছে যেন ভেতর থেকে! স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল নিতাই। কুকুরকে ভীষণ ভয় ওর। কুকুর দেখলেই হল, চব্বিশ হাত তফাতে হাঁটবে।

—আয়, দাঁড়িয়ে গেলি কেন? তাড়া লাগালো পল্টু।

—কুকুরের ডাক শুনছিস না? ফিসফিসিয়ে বলল নিতাই—জানি আমি, এ্যালসেসিয়ন কুকুর ওটা। ভীষণ বদমেজাজী হয় এই কুকুরগুলো।

—তাই নাকি? দাঁড়িয়ে গেল পল্টুও। বলল—তাহলে কি করবি?

সবকিছুরই অবশ্য সমাধান হয়ে গেল ঠিক এই মুহূর্তে। নির্মল সোমের ঘর থেকে মস্ত এক ডলপুতুল হাতে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ঝুমকো ঝুমকো চুল মলা সাত আট বছরের একটি মেয়ে। ওদের দেখেই জিজ্ঞাসা করল ক্যাটক্যাটে গলায়—কে গো তোমরা? চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন ভূতের মত?

কথাগুলোতে মেজাজ চড়ে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল পল্টু—খাতা নিতে এসেছি আমরা। পুতুলের পেট টিপে মিঁয়াও মিয়াওঁ শব্দ করল মেয়েটি। তারপর চেঁচিয়ে বলল—ও বাপী, কারা সব যেন খাতা নিতে এসেছে।

—কে রে মুনমুন? বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নির্মল সোম। তারপর ওদের দেখে বললেন—ওমা, তোমরা? তা দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস ঘরে এস।

মুনমুনের হাত ধরে ঘরে এলেন নির্মলবাবু। পিছু পিছু এল পল্টু আর নিতাই। সন্ত্রস্ত ভাবে ঘরে ঢুকেই তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল নিতাই। কুকুরটা কোথায়? চলে গেল নাকি? একটু আগেও তো ঘরেই ছিল!

—কিগো, দেখছ কি অমন করে? হাসি হাসি মুখে বললেন নির্মলবাবু।

—মানে ··কুকুরটা কোথায় ? একটু আগেই সে ডাকছিলো ? উত্তরে হো হো করে করে হেসে উঠলেন নির্মল সোম। আর ক্যাটক্যাটে স্বরে চেঁচিয়ে বলল মুনমুন—ও বাপী, কেমন বোকা ছেলে দেখেছ ; বলছে, কুকুরটা কোথায় ?

'বোকা' বলাতে আত্মসম্মানে লাগলো পল্টুর। এইটুকু একটা মেয়ে কি-না বোকা বলছে ওকে ! কাজেই একটু চড়া সুরেই বলল সে —বোকা বলছ কেন ? কুকুরের ডাক শুনেছি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—ও বাপী দেখেছ, একই গলায় বলল মুনমুন—কিছু বুঝতে পারে নি ছেলেটা ; ওটা কুকুরের ডাক হবে কেন ? আমার বাপী মুখ দিয়ে শব্দ করছিল অমন করে।

অবাক চোখে তাকালো নিতাই। মিটিমিটি হাসছিলেন নির্মল সোম। বলল নিতাই—একটুও বুঝতে পারি নি আমরা।

—বুঝবে কি করে ? বলল মুনমুন—মুখ দিয়ে আরো কতরকমের শব্দ করতে পারে আমার বাপী। তোমরা তো আর শোন নি। ও বাপী, কোকিলের মত ডাক না একবার, ছেলেগুলো শুনবে।

—আঃ মুনমুন, বিরক্ত কোরো না। মৃদু ধমক দিয়ে বললেন নির্মল সোম—পরে শোনাব।

—না বাপী, এখনই শোনাও ; ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, শুনবে।

বারবার 'ছেলেগুলো' বলাতে চটে উঠেছিল পল্টু। কেমন মেয়েরে বাবা ! ভদ্রতা জানে না ! তা ছাড়া 'ভূত' বলেছিল একবার। আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এদিক ভেবেই বলল সে—না, এখন শুনব না আমরা। ভালো লাগছে না।

—না শুনবে তো বয়েই গেল। বলে পুতুলটার পেট টিপতে টিপতে দৌড়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল মুনমুন।

—আচ্ছা, ঘরে এসে বস তোমরা। হাসতে হাসতে বললেন নির্মল বাবু—খাতাটা নিয়ে আসি আমি।

এগিয়ে গিয়ে গদিঅলা সোফায় বসল পল্টু আর নিতাই। বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরটা। ভেলভেটের সব ভারী পর্দা দিয়ে মোড়া জানালাগুলো। নানা রকমের ফ্রেমঅলা বড় বড় ছবি ঝোলানো চারদিকে। তবে দরজার মাথায় দেওয়ালে ঝোলানো ছবিটাই আকারে সবচেয়ে বড়। কেমন যেন এক বিদঘুটে দৃশ্য ছবিতে। রাবণের মত বীভৎস মাথাঅলা একজন লোক হাত নেড়ে কি সব যেন বলছে। পাশেই দাঁড়িয়ে জনা কয়েক লোক। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিতাই। কোন যাত্রা থিয়েটারের ছবি বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু···

খাতা হাতে ঘরে এলেন নির্মল বাবু।

—কি গো, ছবি দেখছ নাকি?

—এটা কোন থিয়েটারের ছবি। তাই না? ঘাড় ফিরিয়ে বলল নিতাই। হাসলেন নির্মল বাবু। বললেন—ধরেছ ঠিকই। আর ঐ যে রাবণের মত লোকটা দেখছ, ওটা হল আমি।

—আপনি!

—হ্যাঁ। এককালে যাত্রা থিয়েটার করেছি অনেক, সে একদিন গিয়েছে বটে।

—এখন আর করেন না? জিজ্ঞাসু চোখে বলল পল্টু।

—এখন কি আর পারি রে বাবা? বয়স হয়েছে। তা ছাড়া হাড় গোড়ও নরম হয়েছে অনেক। বেশি লাফালাফি করলে পরে হাঁফ ধরে বুকের ভেতরটায়। বলতে বলতে সোফায় বসলেন নির্মলবাবু। তারপর সিগারেট ধরিয়ে খাতাটা পল্টুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—যাক ওসব কথা। নাও, খাতাটা নাও। দিয়ে দিও নকুড়কে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে খাতা হাতে করে দরজার দিকে এগুলো পল্টু। পিছু নিল নিতাই।

বেশ খানিকটা হেঁটে আসবার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নিতাই।

—কি রে? আর যাবি না? তাড়া লাগালো পল্টু।

—ভাবছি একটা কাজ সেরে যাব। তুই বরং যা।

—নিশ্চয়ই জঙ্গলে যাবি। তাই না?

—কে বলেছে তোকে?

—আমি জানি। তবে শোন নিতে, ওদিকে যাসনে বলে দিচ্ছি। নকুড় মামা জানতে পারলে কিন্তু রাগ করবে ভীষণ।

—ওদিকে যাব না আমি; গম্ভীর গলায় নিতাই বলল—ভাবছি টিটোর কাছে যাব একবার। একটা বই আনতে হবে।

—ও, বই আনবি? ঠিক আছে, যা তাহলে। তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।

চলে গেল পল্টু। আর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওর অপস্রিয়মান দেহটার দিকে চেয়ে রইল নিতাই। পরে বাঁকের ওধারে ওর ছায়াটা মিলিয়ে যেতেই দ্রুত ভিন্ন পথ ধরল সে। হাঁটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। একরকম বাধ্য হয়েই পল্টুকে টিটোর ওখানে যাবার কথাটা মিথ্যে বলতে হয়েছে ওকে। এছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না। পল্টুর কানে গেলেই রাষ্ট্র হয়ে যেতো কথাটা। আর তাহলেই তদন্তকার্যের ইতি। অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ঘটে গেলে বিপত্তিটা। ইট বের করা এবড়ো খেবড়ো পথে আচমকা এক বিশাল হোঁচট খেয়ে অতর্কিতে পাশের ঢালু জমিতে পাঁচ-ছ হাত দূরে ছিটকে পড়ল নিতাই। চোট লাগলোও বেশ। ইট পাথরের রুক্ষ ঘষাতে হাত পায়ের ছাল বাকলা উঠে গেল জায়গায় জায়গায়।

অন্য সময়ে হলে কি হত কে জানে, তবে ঠিক এই মুহূর্তে বর্তমান অভিযানে তার পদমর্যাদার কথা স্মরণ রেখেই কোন মতে উঠে দাঁড়ালো নিতাই। তারপর সার্ট প্যান্টের ধুলোগুলো ঝারতে লাগলো হাত দিয়ে। আর, ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল

প্যাণ্টের পকেটে রাখা সেই বটপাতার মোড়কটার কথা। ইস! ব্যাটারিটা ভাঙ্গে নি তো?

দ্রুত পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোড়কটা খুলতেই কিন্তু হতাশ হতে হল ওকে। যা ভেবেছিল তাই-ই। অর্থাৎ কিনা ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে ব্যাটারিটা। কিন্তু, এসব কি! ভুরু কুঁচকে বটপাতার মোড়কে লেগে থাকা কালো গুঁড়ো গুঁড়ো পদার্থগুলোর দিকে চেয়ে রইল নিতাই। ব্যাটারি ভাঙ্গলে এমন গুঁড়ো হয়ে যায় নাকি? তা ছাড়া জিনিসগুলোই বা কি? আর, ব্যাটারির মধ্যেই বা এলো কেমন বরে?

একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের দিকে আবার হন্‌হন্‌ করে হাঁটা দিল নিতাই।



সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এখন। বারান্দায় বসে সেই খুনের বিষয় নিয়েই তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত নকুড়মামা, অমিত সেনগুপ্ত, নিমাই রায় আর হরিদাস চন্দ। এদিকে দরজার গায়ে কান পেতে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে নিতাই।

বলছিলেন নকুড় মামা—ব্যাপারটা কি হে? এখন পর্যন্ত সত্যেন বাবু তো আমার কাছে এলেনই না!

—আর এসেই বা কি হবে? হরিদাসবাবু বললেন—খুনী ধরা পড়বে?

—ভালো কথা নকুড়; চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে বসে বললেন

নিমাইবাবু—ছেলেগুলো আজ আর জঙ্গলের দিকে যায়নি তো?
উত্তরে নকুড়মামা কিছু বলবার আগেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসলেন হরিদাসবাবু; হেসে বললেন—অযথাই ঐ ছোকরাগুলোকে সন্দেহ করছে পুলিশ, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? আমার মনে হয়, অত সোজা নয় ব্যাপারটা—আরো কিছু প্যাঁচ আছে ভেতরে।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। উঠে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন নকুড়মামা। নির্মল সোম এলেন এমন সময়। কোন কথা না বলে একেবারে বাঁ দিকের চেয়ারে গিয়ে বসলেন চুপটি করে।

—কি হে নির্মল, অমন গুম মেরে বসে রইলে যে? হয়েছেটা কি? জিজ্ঞাসা করলেন নিমাইবাবু।

—আর কি হবে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন নির্মলবাবু—আচ্ছা মুশকিলে পড়েছি ঐ পাগলটাকে নিয়ে।

'পাগল' কথাটা কানে আসতেই সতর্ক হল নিতাই। লোকটা না কি গত রাতে অরূপ দত্তের বারান্দায় উঠে এসেছিল হঠাৎ। উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল জানালা দিয়ে। বাড়ির চারকটা দেখতে পায় হঠাৎ; আর তারপর তো হুলুস্থুলু কাণ্ড। অরূপবাবু নাকি আজ সকালেই জানিয়ে এসেছেন পুলিশকে।

বলছিলেন নির্মলবাবু—অরূপের ঘরে তাও তো ঢুকতে পারে নি। আর, আমার অবস্থা কি জান? ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল একেবারে?

—সে কি! বললেন অমিতবাবু—বড্ড বেড়ে উঠেছে দেখছি!

—তারপর শোন কি হল? এ পর্যন্ত বলতেই নির্মল সোমের কথায় ছেদ পড়ল হঠাৎ। গেট খুলে হন্তদন্ত ভাবে ছুটে এলেন অরূপ দত্ত। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন কোনমতে—এই যে, সকলেই আছ দেখছি। যাক্, মারাত্মক একটা খবর—শুনেছ?

উৎসুক চোখে তাকালেন সকলে।

বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন অরূপ দত্ত। এদিক ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—নিত্যলালকে নাকি খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করছে পুলিশ।

—বল কি! উত্তেজিত ভাবে বললেন নিমাইবাবু।

—এ যে বিশ্বাস হয় না! তা তুমি শুনলে কোত্থেকে? নকুড় মামা বললেন।

—ও-ই বলল আমাকে; আসবার পথে দেখা হল হঠাৎ। শুনলাম সত্যেনবাবু নাকি ওর বাড়ি গিয়েছিলেন; বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছে বেচারা, শুকনো মুখে বারান্দায় বসে আছে দেখলাম।

—তা তো ঘাবড়ানোর ব্যাপারই বটে, অমিতবাবু বললেন—কিন্তু ওকে সন্দেহ করবার কারণটা কি শুনি? কিছু প্রমাণ পেয়েছে নাকি পুলিশ?

—কি আবার পাবে? লাইটার ঠুকে সিগারেট ধরিয়ে বললেন অরূপ দত্ত-পুলিসের যত্তোসব আজগুবি কাণ্ড কারখানা। প্রথমে সন্দেহ করল নকুড়ের ভাগ্নে ওদের—তারপর নিত্যলালকে। বেছে বেছে সন্দেহ করবার লোকও যোগাড় করে বটে ওরা।

—হয়তো কারণ কিছু আছে, নির্মলবাবু বললেন—নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু দেখেছে নিত্যলালের ওখানে?

—কে জানে, সব কথা তো আর বলল না, তবে কি এক টর্চের ব্যাটারি নাকি কুড়িয়ে পেয়েছে ওর বাগান থেকে।

—টর্চের ব্যাটারি! জিজ্ঞাসু চোখে নকুড় মামা বললেন—তা পেয়েছে তো কি হয়েছে? টর্চ মেরামতের ব্যবসা নিত্যলালের, তা ছাড়া গোটা হাসিমারায় একমাত্র ওই ব্যাটারি বিক্রি করে।

—তাহলে ব্যাটারির বদলে রবারের বল কুড়িয়ে পাবে নাকি? ঠাট্টার সুরে বললেন হরিদাস চন্দ।

গেটের বাইরে সাইকেলের ক্রীং ক্রীং শব্দ কানে এল এমন সময়।

দরজার ফুটো দিয়ে দেখলো নিতাই, কালো রঙের ফুল সোয়েটার পরা রোগা লম্বামত—একজন লোক গেট খুলে ভেতরে এসে ঢুকলো। অচেনা বলে মনে হল লোকটাকে। এখানে আসবার পর নিতাই অন্তত পথে ঘাটে দেখেনি কোনদিন। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ছিলেন নকুড়মামা; এবারে বললেন—কি চাই? কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

—থানা থেকে; ছোট্ট জবাব দিল লোকটা।

—থানা থেকে! তা, ব্যাপার কি বলুন তো? বললেন হরিদাসচন্দ। প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল লোকটা; তারপর ভাঁজ খুলে চোখের ওপর মেলে ধরে বলল—কয়েকজনের নাম লিখে দিয়েছেন ইন্সপেক্টর সত্যোনবাবু, দেখুন তো, সকলে উপস্থিত আছেন কি-না এখানে? কথা শেষ করে নামগুলো পড়তে শুরু করল লোকটা—নকুড় নস্কর; হরিদাস চন্দ, অরূপ দত্ত, নির্মল সোম, নিত্যলাল চক্রবর্তী, নিমাই রায় আর নকুড় নস্করের ভাগ্নে এবং তার বন্ধুরা। আছেন সকলে?

—নিত্যলাল চক্রবর্তী এখানে নেই, শুকনো গলায় বললেন নকুড় মামা—এবং আজ আসেনও নি।

—বেশ; তা তিনি ছাড়া আর সকলে আছেন তো? পেন্সিল দিয়ে কাগজটাতে কি যেন লিখতে লিখতে বলল লোকটা।

—আছেরে বাবা, আছে; অধৈর্য ভঙ্গিতে হরিদাসবাবু বললেন—তা, সত্যোনবাবু কি করতে বলেছেন এদের? গ্রেপ্তার করতে নাকি? অল্প একটু হেসে বলল লোকটা—না, তা নয়; তবে আগামীকাল বিকেলে ঠিক চারটায় এইখানেই হাজির থাকতে বলেছেন সকলকে।

—তার মানে! চেঁচিয়ে বললেন নির্মলবাবু—বললেই হল? কেন, খুন করেছি নাকি আমরা?

—অতশত জানি নে, হুকুম মত কাজ করলাম কেবল। ইচ্ছে হলে থাকবেন, নইলে থাকবেন না। বলতে বলতে গেটের দিকে

হেঁটে গেল লোকটা। তারপর সাইকেলে উঠে বেল বাজাতে বাজাতে চলে গেল ক্রীং ক্রীং শব্দে।

—ব্যাপারটা কি হে? চাপা গলায় নিমাই বাবু বললেন—হঠাৎ এমন নির্দেশ পাঠালেন সত্যেনবাবু?

—কে জানে; হয়তো আমাদের উপস্থিতিতেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে চান ভদ্রলোক; বললেন অমিত বাবু—তাই-ই হয়তো এক জায়গায় হাজির থাকতে বলেছেন সকলকে।

—তা অবশ্য হতে পারে; চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন অরূপ দত্ত—যাকগে আমি চলি এখন; একটা কাজ রয়েছে আবার।

—চল, আমিও যাব; উঠলেন হরিদাস বাবুও।

বাকি সকলেও অবশ্য আর থাকতে চাইলেন না বেশিক্ষণ। কিছু কথাবার্তার পর বিদায় নিলেন সকলেই।



রাত এখন গভীর। মাথা পর্যন্ত লেপে ঢেকে অঘোরে ঘুমুচ্ছে পল্টু, মলয়, বিশু আর নিতাই। ঘুমুচ্ছে নকুড় মামাও। নিঝুম নিস্তব্ধ চারদিক। ছুঁচ পড়বার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়—এমন অবস্থা। নিতাই এর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল হঠাৎ। কিসের একটা বিদঘুটে শব্দ কানে আসছে না! কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল নিতাই। হ্যাঁ, প্রাচীর ঘেঁষা পেয়ারা গাছটার ওদিক থেকেই যেন আসছে শব্দটা। মনে হচ্ছে কেউ যেন বাগানের ভেতর নামতে চাইছে পেয়ারা গাছ বেয়ে। পাতা নড়বার খচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

খুব ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল নিতাই। তারপর লেপ সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পা টিপে এগিয়ে গেল বাগান সংলগ্ন এক পাল্লা খোলা জানালাটার দিকে। বাইরে ঝলমল করছে শীতকাতুরে চাঁদের ঠাণ্ডা নরম আলো। হয়ত পূর্ণিমা হবে আজ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব কিছু। ডালপালা নড়াচাড়া করবার খসখস শব্দটা কানে এল আবার। বাঁ দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে পেয়ারা গাছের দিকে চোখ ফেরাতেই যেন বিদ্যুতের শক্ খেলো নিতাই। পিলে চমকানো ভয়ের এক শীতল অনুভূতি হঠাৎ যেন উঠে গেল শিরদারা বেয়ে। এ কাকে দেখছে ও!

একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা লোক যেন বাগানে নামতে চাইছে পেয়ারা গাছ বেয়ে!

মুখটা অবশ্য ঠিক দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। ফেল্ট হ্যাটের অনেকটা অংশ বেশ খানিকটা ছায়া ফেলেছে মুখ জুড়ে। তবে, সঠিক ভাবে চেনা না গেলেও অনেকটা যেন হরিদাস চন্দের মত বলে মনে হচ্ছে লোকটাকে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ যেন হিম হয়ে এল বুকের রক্ত। তবে কি···তবে কি···হরিদাস চন্দই হলে যাবতীয় দুর্ঘটনার নায়ক! এ যে কল্পনাতীত! এমন মানুষ কি-না এতবড় একটা চক্রান্তের সর্বাধিনায়ক!

সম্বিৎ ফিরে পেলো নিতাই। 'ঝুপ' করে মাটিতে লাফিয়ে পড়বার শব্দ কানে এল হঠাৎ। বাগানে নেমে ওধার দিয়ে ঘুরে গেল লোকটা। তারপর কি একটা যেন বারান্দার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই আবার তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়। ওধারে লাফিয়ে পড়বার শব্দ শোনা গেল কেবল; কিন্তু দেখা গেল না কিছু। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো নিতাই। কি ঘটল ব্যাপারটা? বারান্দার দিকে অমন করে কি ছুঁড়ে দিয়ে গেল লোকটা? টাইম বোমা টোমা নয় তো? হতেও পারে হয়তো বা। "চণ্ডালের নিঃশ্বাস" বইটার কথা মনে আছে পরিষ্কার।

থানার পাশে টাইম বোমা রেখেই গোটা বাড়িটা ছাতু করে দিয়েছিল হত্যাকারী। অথচ··· ; ভাবনায় ছেদ পড়ল হঠাৎ ; হাঁড় কাঁপানো রাত্রির শীতল নিস্তব্ধতাটুকু ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে দূর থেকে কানে ভেসে এল রক্ত জল করা সেই অট্টহাসি ঃ হা-হা-হা।

সচকিত হয়ে উঠল নিতাই। জঙ্গলের সেই মুখে চূণ কালি মাখা পাগলটাই হাসছে এমন করে। কিন্তু কেন ? একটু আগেকার সেই কোট প্যান্ট পরা লোকটাকে দেখে ফেলেছে কি ? চিনতে পেরেছে কি লোকটাকে ? আর যদি চিনে ফেলেও, তবে তো···

পেয়ারা গাছের ডালপালা নড়বার শব্দ শোনা গেল আবার। বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো নিতাই। আবার কে আসতে চাইছে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ? সেই কোট প্যাণ্ট পরা লোকটাই নাকি ? ঝাঁকড়া ডালপালাগুলোর ফাঁক দিয়ে এবারে প্রাচীরের ওপর উঁকি দিল একটা মুখ। কিন্তু, ও কি ! ও কার মুখ !!

প্রবল এক ভীতিকর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল নিতাই।

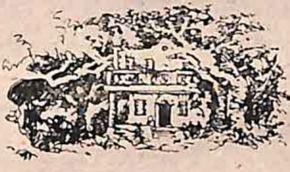
রামলাল !

কিন্তু, এমন গভীর রাতেই বা কোথায় গিয়েছিল রামলাল ? তা ছাড়া প্রাচীর টপকে এমনভাবে চোরের মত ফিরছেই বা কেন ? তাহলে কি ঐ কোটপ্যাণ্ট পরা হরিদাস চন্দের মত দেখতে লোকটার সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ আছে ? কে জানে, থাকতেও পারে হয়তো !

পেয়ারা গাছ বেয়ে বাগানে নেমে এল রামলাল। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিকে দেখে নিল একবার ; তারপর পা টিপে টিপে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল নিতাই। বোঝা গেল না কিছুই। অনেকগুলো প্রশ্ন যেন ঠিক এই মুহূর্তে ভিড় করে বসেছে মাথার একেবার ভেতরটায়। কোটপ্যাণ্ট পরা লোকটা কে ? হরিদাস চন্দই কি ? তা ছাড়া বাগানে নেমে বারান্দার দিকে অমনভাবে কি জিনিস ছুঁড়ে দিল ?

রামলালই বা এত রাতে গিয়েছিল কোথায় ? আর, প্রাচীর টপকেই বা ফিরল কেন ? আসল খুনী তাহলে কে ? ঐ কোটপ্যাণ্ট পরা লোকটা ? নাকি রামলাল ?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে বিছানায় এসে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল নিতাই।



ঘুম ভাঙ্গলো অনেক বেলায়। সকালের নরম রোদ এসে আছড়ে পড়েছে মেঝেতে। পাশেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে বিশু। মলয় আর পল্টু অবশ্য বিছানাতে নেই। বেড়াতে বেরিয়েছে হয়তো। উঠে বসল নিতাই।

নকুড় মামার গলা শোনা যাচ্ছে বাইরে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। দরজায় ছায়া পড়ল। মলয় ঢুকলো ঘরে।

—কে এসেছে রে ?

—অমিত সেনগুপ্ত। বিছানায় এসে গা ঘেঁষে বসল মলয় ; বলল—জানিস, টিটো নাকি ওদের বৈঠকখানা ঘরের পাশ থেকে সকালে একটা ব্যাটারি কুড়িয়ে পেয়েছে।

—ব্যাটারি ? কে বলল তোকে ?

—কে আবার বলবে ? এই জন্যেই তো নকুড় মামার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন অমিত বাবু। ঘাবড়ে গেছেন ভীষণ ; বলছেন নিত্যলাল বাবুর মত নাকি পুলিশ এবার থেকে ওঁকেই সন্দেহ করতে শুরু করবে।

—তা নকুড় মামা কি বললেন ?

—বলবেন কি ? ওঁরও তো একই অবস্থা। তুই তো আসল কথাটাই শুনিস নি এখন পর্যন্ত! এটুকু বলার পর ফিসফিসিয়ে বলল মলয়—নেহাৎ আমি দেখে ফেলেছি বলে ; নইলে কাউকেও বলতেন না নকুড় মামা— ;

রামলাল ঘরে ঢুকলো এমন সময়। ইঙ্গিতে মলয়কে চুপ করতে বলেই জানালার দিকে তাকিয়ে রইল নিতাই। যেন খোলা জানালার ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছে সে। পানের দাগধরা দাঁতগুলো বের করে একগাল হেসে বলল রামলাল—কিগো দাদাবাবুরা, আর কতডা ঘুমুবেন ? খাবারগুলা যে সব জল হইয়ে গেল।

কে জানে, বিশু হয়তো বা জেগেই ছিল এতক্ষণ। রামলালের কথাতে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে বলল—কি খাবার করেছ গো আজ ? কাঁধের গামছায় ঠোঁটের কষ দু'টো মুছে নিল রামলাল ; বলল—মাংসের সিঙ্গাড়া গো ; খুব সুন্দর লাগবেন নি খেইতে। গরম গরম খেইয়ে নাও ঝটপট।

—ওহ্ ফাইন! চোখ নাচিয়ে বলল বিশু—এক্ষুণি আসছি।

—হ্যাঁ, এইস ঝটপট···বলতে বলতে দরজার বাইরে চলে গেল রামলাল।

—এবারে বল্ মলয় ? বলল নিতাই—কি যেন দেখেছিস বলছিলি ?

—হ্যাঁ—শোন ; আজকে কিন্তু সবার চাইতে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি আমি। উঠে সবে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ দেখি কি, বারান্দাটার ঠিক পাশেই মাটিতে একটা ব্যাটারি পড়ে আছে।

—কেমন ব্যাটারি ?

—ঐ যে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম না? ঠিক ওরকমই একটা ব্যাটারি।

—তারপর?

—তারপর বারান্দা থেকে নেমে যেই হাত দিয়েছি ব্যাটারিতে, ঠিক তখনই যেন কি করে দেখে ফেললেন নকুড় মামা। নিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে।

—নিয়ে নিলেন? আক্ষেপের স্বরে নিতাই বলল—এত বড় একটা প্রমাণ হাতে পেয়েও রাখতে পারলি না?

—আমার কি দোষ? ব্যাটারিটা যেই পকেটে ভরতে যাব, দেখি নকুড় মামা দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে পেছনে। ভীষণ গম্ভীর মুখে আমাকে বললেন—'ব্যাটারিটা দে; পকেটে রাখবার জিনিস না এটা।' কি আর করি তখন, দিয়েই দিতে হল।

—ঠিক আছে, তুই যা; গম্ভীর মুখে নিতাই বলল—একটু ভাবা দরকার এ ব্যাপারে।



জলখাবারের পালা শেষ করে টিটোর ওখানে ক্যারম খেলতে চলে গেল বিশু, মলয় আর পল্টু। শরীরের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল নিতাই। ঠিক এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এক পা-ও নড়া চলবে না। প্রতিটি মিনিটের গুরুত্ব এখন অপরিসীম। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই দরজার কাছে এল নিতাই। অমিত সেনগুপ্ত বসে আছেন এখন পর্যন্ত। ঠিক মুখোমুখি চেয়ারে বসে

নকুড় মামা তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। গভীর ভাবে ভাবছেন কিছু একটা।

নির্মল সোম আর হরিদাস চন্দ এলেন এমন সময়। বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন নির্মল বাবু; আর কোণাকুণি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন হরিদাস বাবু। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো নিতাই। মেলাতে চাইলো গতরাতের সেই কোটপ্যাণ্ট পরা আগন্তুকের সঙ্গে। কিন্তু, না; মেলানো গেল না। কারণ, আজ আবার সেই লাল রঙের সোয়েটার পরে এসেছেন হরিদাস বাবু।

বলছিলেন নির্মল সোম—ভালো ঝামেলায় পড়লাম দেখছি। ব্যাটারি কুড়িয়ে পাওয়ায় এবার তো নিত্যলালের মত আমাকে নিয়েও টানা হ্যাঁচড়া শুরু করবে পুলিশ!

—সে দশা তো আমারও। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন অমিত সেনগুপ্ত।

—আমার অবস্থা কিন্তু আরো মারাত্মক; একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন হরিদাস বাবু—ব্যাটারি তো একটা পেয়েইছে। উপরন্তু কোটটাও খুঁজে পাচ্ছি না আবার।

এবারে মৃদু হাসলো নিতাই। প্রকৃত খুনী যে হরিদাস চন্দ—এ ব্যাপারে আর সন্দেহ নেই কোন। দরকার মত কোটটা পরে গভীর রাত্রে বাইরে বেরোন ভদ্রলোক। আর যদি কেউ দেখতে পেয়ে থাকেন—এই ভয়ে সর্বত্র রটিয়ে বেড়ান যে হারিয়ে গেছে কোটটা। যাতে করে তেমন পোশাকে ওঁকে কেউ দেখে ফেললেও সন্দেহ করতে না পারে ঝট করে। কারণ জিনিসটা তো তিনি হারিয়েছেন আগেই।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। হরিদাস চন্দের কণ্ঠস্বর কানে এল আবার—তবে অরূপের অবস্থা কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক।

—কেন? কি হয়েছে ওর? জিজ্ঞাসু চোখে নকুড় মামা বললেন।

—আসবার পথে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। বলল, ব্যাটারি পেয়েই নাকি সোজা সত্যেন বাবুর হাতে জমা দিয়ে এসেছে ও।

—সেকি! অবাক চোখে অমিত বাবু বললেন—এমন বোকার মত কাজ করল কেন? সাধ করে কেউ কি পুলিশের খপ্পরে পা দেয়?

এবারে টেরটি পাবে বাছাধন; খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে হেসে বললেন হরিদাস বাবু—সাধু সাজার ফলটা এবার টের পাবে হাড়ে হাড়ে।

—যাকগে যা ভালো বুঝেছে করেছে; আমাদের কি তাতে? চেয়ার ছেড়ে উঠলেন অমিত বাবু; বললেন—আচ্ছা, চলি তাহলে। টিটোটা আবার বাড়ি আছে একা।

—চল, আমিও যাব; বললেন হরিদাস বাবু—হ্যাঁ, ভালো কথা; থানায় গিয়ে তোমরা কেউ কি ব্যাটারি জমা দেবে?

—না, আমি দেব না; একটু ভেবে নিয়ে নির্মল বাবু বললেন—তবে, আমার মনে হয় সত্যেনবাবুকে একবার জানানো দরকার। নইলে কোনমতে যদি একবার জানতে পারেন, সহজে কিন্তু ছেড়ে দেবেন না কাউকে।

—হ্যাঁ, এখন তো বলতেই হবে; বিরক্তিপূর্ণ মুখে নকুড় মামা বললেন—কেউ যদি না বল তো, একটা কথা ছিল। কিন্তু ঐ অরূপটাই তো সব মাটি করল।

—ওকে দোষ দিয়ে আর কি হবে? বললেন নির্মল সোম—খবর না দিলেও যে করেই হোক জানতে পারবেন সত্যেন বাবু। আমাদের নিত্যলালের কথাটাই ধর না কেন; ও কি আর খবর দিয়েছিলো? অথচ সত্যেনবাবু কিন্তু বুঝে নিয়েছিলেন।

—বলেছ ঠিকই; যার ভাগ্যে যা আছে—ঘটবেই; কেউ আটকাতে পারবে না; বলতে বলতে গেটের দিকে হেঁটে গেলেন হরিদাস চন্দ। এবং আর কিছু কথাবার্তার পর বিদায় নিলেন বাকি সকলেই।



বেলা প্রায় তিনটে। কি একটা যেন ছুটির দিন আজ। তাই বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছিলেন নকুড় মামা, অমিত সেনগুপ্ত, নিমাই রায় আর অরূপ দত্ত। এদিকের ঘরে লুডো খেলায় ব্যস্ত পল্টু, বিশু আর মলয়। একটু তফাতে বিছানায় শুয়ে টিটোর কাছ থেকে আনা বইটা পড়ছে নিতাই। বেশ খানিকক্ষণ এক নাগাড়ে পড়বার পর বইটা একদিকে মুড়ে রেখে হঠাৎ বলল—শোন্, একটা কথা বলি তোদের। জঙ্গলে যাবার ব্যাপারে যদি পুলিশের দারোগা কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কিন্তু কোন কিছু বলবি নে তোরা। যা বলার আমিই বলব।

—কেন? আমরা বললে কি হবে? গোল গোল চোখে তাকাল বিশু। জবাবে "চণ্ডালের নিঃশ্বাস" বই-এর ডিটেকটিভ অষ্টপদ সেনাপতির কথাগুলো মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিয়ে বলল নিতাই—পরিস্থিতির হেরফেরে এখন এক একটি অক্ষরের মূল্য, এক একটি জীবনের মতই অপরিসীম।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বিশু।

আর ঘাড় নেড়ে বলল পল্টু—ঠিক আছে, তুই-ই বলিস বরং।

নির্মল সোম আর নিত্যলাল বাবু এলেন পৌনে চারটে নাগাদ। আরও মিনিট কুড়ি পরে এলেন সত্যেন বাবু। জানালা দিয়ে দেখেই বিছানা ছেড়ে নামলো নিতাই। তারপর ওদিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো চারজনে। গতকালের লিস্টে যাদের নাম ছিল—

হাজিরা দিয়েছেন সকলেই। গমগমে গলাতে বলছিলেন সত্যেন বাবু —সকলেই জানেন যে গত পরশু জঙ্গলের ভেতর নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সুবল সাহা। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় যে খুব কাছ থেকে ·২৫ বোরের রিভলভারে গুলি করা হয়েছে ওঁকে। ভালো কথা নকুড় বাবু, আপনি হয়তো জানেন না যে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আপনার ভাগ্নে আর তার বন্ধুদের ভূমিকাও কিন্তু নেহাৎ কম নয়।

—হ্যাঁ, জানি, ক্ষীণ কণ্ঠে নকুড় মামা বললেন—ওদেরই তো খুনের আসামী বলে সন্দেহ করছেন আপনি।

—কিন্তু, আমরা কি করে খুন করব? আমাদের কি বন্দুক আছে? উত্তেজনার মাথায় কথাগুলো হঠাৎ ছিটকে বেরুলো বিশুর মুখ থেকে।

মৃদু হাসলেন সত্যেন বাবু। বললেন—তোমরা খুন করেছ, এমন কথা আমি বলি নি। তবে সুবল বাবুকে যখন হত্যা করা হল, ঠিক ঐ মুহূর্তেই কিন্তু লুকিয়ে ছিলে সংলগ্ন একটা ঝোপের আড়ালে। বল, একথা কি অস্বীকার করতে পারবে?

এই একটি মাত্র কথাতেই যেন বজ্রপাত হল ঘরের ভেতর। আঁৎকে উঠে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন নকুড় মামা। আর উপস্থিত প্রতিটি মানুষ হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইলেন ওদের দিকে।

—বলছেন কি ইন্সপেক্টর! শুকনো গলায় বললেন নিমাই বাবু।
—খুন হবার সময় ছেলেগুলো ওখানে ছিল!

—শুধু তাই-ই নয়, ঝোপের আড়াল থেকে আগাগোড়া ঘটনা দেখেছে ওরা। কই কি হল তোমাদের? সত্যি কথাটা বলে ফেল ঝট্ করে?

প্রবল ভয়ের চাপে দাঁত মুখ সিঁটিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল পল্টু। একটি কথাও বলবে না ও; যা বলার নিতাই বলুক। মাথা নীচু করে আঙ্গুলের নখ খুঁটতে লাগলো মলয়। কিছু বলবার উপায় নেই তার; গলাটলা সব শুকিয়ে কাঠ।

—কিরে, হলটা কি তোদের ? খেঁকিয়ে উঠলেন হরিদাস চন্দ—সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন সব ? সত্যি কথাটা কি বলা যাচ্ছে না ?

এতক্ষণে সামান্য নড়েচড়ে দাঁড়ালো নিতাই। বই-এ পড়া ডিটেকটিভদের কথাগুলো মনে মনে একবার ভেবে নিয়ে নিজেকে সবল করে তুলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল কোনমতে—হ্যাঁ, ওখানে ছিলাম আমরা ; সবকিছু দেখেছি।

—বলিস কি ! স্থানকাল ভুলে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন নকুড় মামা।

—ঠিকই বলছে। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন সত্যেন বাবু—ওয়েল, কাজের কথায় আসা যাক এবার। জঙ্গলের ঐ পড়ো বাড়িটার আশপাশ থেকে যে ভাবেই হোক কিছু প্রমাণ হাতে আসে আমার। বলতে বাধা নেই, তখন থেকেই নিত্যলাল বাবুকে সন্দেহ করতে শুরু করি। তাছাড়া, আরো একটি বিশেষ প্রমাণ ওর বাগান থেকে কুড়িয়ে পাওয়ায় আমার চোখে এক নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান ভদ্রলোক। একটু থেমে আবার বললেন সত্যেন বাবু—কিন্তু, আমার এই ধারণাটি যে কতবড় ভুল, তার প্রমাণ পেলাম আজ সকালে। জানতে পারলাম অরূপ দত্ত থেকে শুরু করে সকলেই না কি একটা করে ব্যাটারি পেয়েছেন আজ তাদের বাড়ির আশপাশ থেকে। তাই না ?

ঘাড় নাড়লেন সকলেই। বললেন নির্মল সোম—এবারে কি তবে সকলকেই সন্দেহ করতে শুরু করবেন ?

—ঠিক বলেছ : সমর্থন জানিয়ে বললেন নিত্যলাল বাবু—এই কারণেই আমাকে হাসিমারার বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন সত্যেন বাবু।

—বেশ তো, এবার তাহলে সেই নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নিন। বললেন নিমাই বাবু।

—হ্যাঁ, তুলব ; তবে ঠিক এই মুহূর্তে নয়। কারণ, আরো কিছু গোলমেলে ব্যাপার রয়ে গেছে নিত্যলাল বাবুর।

—তার মানে ? মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে বললেন নিত্যলাল বাবু—আপনি কি বলতে চাইছেন যে সুবল বাবুকে আমিই খুন করেছি ?

—না, সে কথা আমি বলতে চাই না। মৃদু হেসে বললেন সত্যেন বাবু—আমি কেবল বলেছি যে আরো কিছু গোলমেলে ব্যাপার রয়ে গেছে আপনার। যেমন. সুবলবাবু যখন খুন হলেন, তার একটু আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল আপনাকে। এখন বলুন নিত্যলাল বাবু, ঐ সময় জঙ্গলে কেন গিয়েছিলেন আপনি ?

—কি আশ্চর্য! ওদিকে কেন যাব আমি ? ছি ছি, দেখেছ নকুড়, কি সব যা তা বানিয়ে বলছে আমার নামে !

—যা বললাম অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ভরাট কণ্ঠস্বর সত্যেন বাবুর।

—না সত্যি নয় ! নাকি গলায় জবাব দিলেন নিত্যলাল বাবু—এক বর্ণও সত্যি নয়। সব মিথ্যে—বানানো।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে শেষাংশটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলেন সত্যেন বাবু। বললেন—ঐ সময়ে আপনি যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তার প্রমাণ দেবে নকুড় বাবুর ভাগ্নে এবং তার বন্ধুরা। ওরাই দেখেছে আপনাকে।

হতচকিত হয়ে পড়লেন উপস্থিত সকলে। এমন অসম্ভব কথা যেন মেনে নেওয়া যায় না কিছুতেই। নীরবতা ভঙ্গ করে কর্কশভাবে নিত্যলাল বাবুই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রথমে—কি ? কি বললেন ! আমাকে দেখেছে ঐ ছোকরাগুলো ! বল্ দেখি, তোদের মধ্যে কে কে সেদিন দেখেছিস আমাকে ? বল্ ?

মুখ সেলাই করে দাঁড়িয়ে রইলো বিশু আর মলয়। ঠোঁট

নেড়ে বিড়বিড় করে রামনাম জপে চলল পল্টু। আর অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো নিতাই। নকুড় মামার দিকে দৃষ্টি গেল একবার। ইশারা করে কিছু একটা যেন বললেন নকুড় মামা। বুঝলো নিতাই, তাকে কোন মন্তব্য করতে নিষেধ জানালেন তিনি।

—ছেলেগুলো দেখছি মহা শয়তান! তীক্ষ্ণ গলায় বললেন অরূপ দত্ত—তলে তলে এত সব ব্যাপারে জড়িয়ে আছে!

—স্টুপিড কোথাকার! লাল লাল চোখে বললেন নিত্যলাল বাবু—কি হল এখন? ছুঁচোর মত সব দম আটকে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বল শীগগির—কে দেখেছিলি?

—অযথা চেঁচাবেন না নিত্যলাল বাবু; খানিকটা চড়া গলাতে কথাটা বলেই নিতাই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন সত্যেন বাবু—কোন ভয় নেই তোমাদের; আমি তো আছি। যা দেখেছিলে—ঠিক ঠিক বলে দাও। কেউ কিছু বলবে না।

কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলো নিতাই। নিত্যলাল বাবুর দিকে তাকালো একবার। অসম্ভব রাগে যেন থরথর করে কাঁপছেন ভদ্রলোক। হাতের মুঠোতে পেলে যেন ছিঁড়ে খাবেন—এমন অবস্থা। কিন্তু তা হোক—ঘাবড়ালে তো চলবে না। বর্তমান অভিযানের ডিটেকটিভ হিসাবে অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে তাকে। কথাগুলো খুব ভালো করে ভেবে নিয়ে ভীষণ এক ঠাণ্ডা গলায় বলল নিতাই—হ্যাঁ, দেখেছি আমরা; জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দেখতে পেয়েছিলাম ওঁকে।

—কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! উল্লুক-বেল্লিক-নচ্ছাড়! দাঁড়া, মজাটা দেখাচ্ছি—। বলতে বলতে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে নিতাই-এর দিকে ছুটে গেলেন নিত্যলাল বাবু। আর একটু হলে হয়তো লাগিয়ে দিতেন একখানা ঘুষি; কিন্তু তৈরি ছিলেন সত্যেন বাবু। বিদ্যুৎ গতিতে এসে জাপটে ধরে ফেললেন নিত্যলাল বাবুকে। তারপর জানালা ঘেঁষা সেই চেয়ারটায় বসিয়ে

দিয়ে জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললেন—এবারের মত কিন্তু ছেড়ে দিলাম আপনাকে। তবে ফের যদি ওদের কারোর গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেন—থানায় নিয়ে আটকে রাখব বলে দিচ্ছি। গোল গোল চোখে তাকিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগলেন নিত্যলাল বাবু; তারপর মাথা হেঁট করে বসে রইলেন চুপটি করে।

—হুঁ, যত্তোসব! নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করে বললেন নির্মল সোম—সত্যি সত্যিই যখন ওদিকে গিয়েছিলে, এত ঝামেলা করার দরকারটা কি ছিল? বলে ফেললেই তো মিটে যেতো!

—ননসেন্স! কি বলব আমি! চেঁচিয়ে বললেন নিত্যলাল বাবু—যা হয় নি, গায়ের জোরে সেটা কি স্বীকার করাবে আমাকে?

—থামুন; অযথা চেঁচামেচি করে লাভ নেই। উপস্থিত আমার কাজ শেষ; বললেন সত্যেন বাবু—এখন যেতে পারেন সকলে।

টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো জীপের দিকে হেঁটে গেলেন সত্যেন বাবু।



পরদিন সকালের কথা। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। বারান্দায় বসে কথা বলছিলেন নকুড় মামা, অমিত বাবু আর নিমাই বাবু। এদিকের ঘরে চুপচাপ বসে আছে নিতাইরা। গতকালের ব্যাপারটার পর বাইরে বেরুবার মত সাহস পায়নি কেউ। অগত্যা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া পথ নেই কোন।

—ওহে অরূপ, ঐ ছ্যাখ, নিত্যলাল আসছে এদিকে। নকুড়

মামার কথাগুলো কানে পৌঁছুতেই এক ছুটে গিয়ে দরজার ফুঁকো দিয়ে উঁকি দিল নিতাই। হ্যাঁ, নিত্যলাল বাবুই আসছেন বটে। কেমন যেন ঝড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে ওঁকে। মাথার চুলটুল সব উস্কোখুস্কো। চোখের তলায় কালি। খুব ছোট ছোট পা ফেলে বারান্দায় উঠে এলেন ভদ্রলোক। তারপর কোণার দিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন ধীরে সুস্থে।

—কি হয়েছে নিত্যলাল, শরীর খারাপ নাকি? জিজ্ঞাসা করলেন নিমাই বাবু। লাল লাল চোখে একটু সময় তাকিয়ে রইলেন নিত্যলাল বাবু। বললেন—না; শরীর ভালোই। যাকগে, শোন নকুড়, একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে!

—আমাকে? খুব দ্রুত ঘাড় ফেরালেন নকুড় মামা।

—হ্যাঁ, তোমাকেই। শোন, আমি এখন যে অবস্থায় পড়েছি, তার জন্যে কিন্তু তুমিই দায়ী।

—আমি? কেন? আমি কি করেছি তোমাকে?

—সে কথা জেনে লাভ নেই তোমার। তবে এটুকু শুনে রাখ, তোমার ঐ ভাগ্নে আর তার বন্ধুগুলোই কিন্তু এমন অবস্থায় ফেলেছে আমাকে। তেমন কিছু ঘটে গেলে কিন্তু তোমাদের কাউকে ছেড়েই কথা বলব না আমি বলে দিচ্ছি।

—দেখ নিত্যলাল; এবারে যেন খানিকটা চড়া গলাতে নকুড় মামা বললেন—তুমি কিন্তু প্রথম থেকেই যা নয় তাই বলতে শুরু করেছ আমাকে?

—বলব না? ঐ হতচ্ছাড়া বাঁদরগুলো যদি ইন্সপেক্টরের সামনে কাল ওভাবে না বলত, তাহলে তো কিছুই হত না আমার। ইস্! কি ভাবে ফাঁসিয়ে দিল আমাকে! বেশ; আমিও নিত্যলাল চক্রবর্ত্তী; ঐ বেল্লিকগুলোকে যদি কোনমতে একবার হাতের মুঠোতে পাই, মারের চোটে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।

কথাগুলো শুনে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠল পল্টু। এবারে রক্ষে

নেই আর। বাইরে বেরুনো চলবে না কোনমতে। আড়চোখে একবার নিতাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল ও ; দাঁত মুখ সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিতাই। একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করা চলবে না এখন। ওদিকে নিত্যলাল বাবুর কথার প্রত্যুত্তরে উত্তেজিত ভাবে বলছিলেন নকুড় মামা—খুব যে গায়ের জোর দেখাচ্ছ দেখছি! এমন কি দোষ করেছে ছেলেগুলো? তুমি জঙ্গলের ওদিকে গিয়েছিলে, সেই কথাটাই বলেছে কেবল ; তাই না নিমাই?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ ; ঘাড় নেড়ে নিমাই বাবু বললেন—বাচ্চা ছেলে ; অতশত কি আর বোঝে ওরা? যা দেখেছে তাই-ই বলে ফেলেছে।

—হুঁঃ, বাচ্চা ছেলে! বললেই হল? রাগে গরগর করতে করতে বললেন নিত্যলাল বাবু—দেখতেই বাচ্চা ওদের ; আসলে বয়স আছে ওগুলোর ; আমার চাইতেও বড় হবে।

—কি যা তা বলছ? প্রতিবাদ করলেন অমিত বাবু—ওরা তোমার চেয়ে বয়সে বড় হলে তো আমার টিটোও তোমার চেয়ে বড়?

—অতশত বুঝি না আমি। তবে নকুড়, ভালো চাও তো ঐ গুণ্ডাগুলোকে সত্যেন বাবুর ওখানে নিয়ে গিয়ে বলে এস যে গত কালের কথাগুলো মিথ্যে মিথ্যেই বলেছে ওরা—এক বর্ণও সত্যি নয়। নইলে কিন্তু অশেষ দুর্গতি আছে তোমার কপালে। এতক্ষণ পরে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন নকুড় মামা। রক্তবর্ণ চোখে চেঁচিয়ে বললেন—তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি নিত্যলাল, বেশি চেঁচামেচি কিন্তু করবে না এখানে। আর একবার এমন কথা বললে ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বের করে দেব।

—কি বললে! এক লাফে চেয়ার ছেড়ে ছুটে এসে নকুড় মামার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন নিত্যলাল বাবু—ঘাড় ধরে বের করে দেবে? দাও তো! কতবড় সাহস তোমার দেখি।

—আহ্‌ নিত্যলাল, বলি হচ্ছেটা কি? চেঁচিয়ে বললেন নিমাই বাবু—পাগল হলে নাকি?

—তুমি চুপ কর নিমাই। আমাদের কথাতে নাক গলাতে এসেছ কেন? আমাকে সকলে যা ইচ্ছে বলবে, আর আমি চুপ করে থাকব?

—কে তোমাকে কি বলেছেন? বললেন নকুড় মামা—সত্যি কথাটা পুলিশের কাছে বলা মানে কি যা ইচ্ছে বলা? বেশ করেছে ওরা—একশ'বার বলবে। কি করবে তুমি?

—আমি? আমি কি করব? ঠিক আছে···এখন ছেড়ে দিলাম···পরে ভালোমত বুঝিয়ে দেব তোমাকে! হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন নিত্যলাল বাবু; তারপর একলাফে বারান্দা থেকে নেমে বড় বড় পায়ে হেঁটে গেলেন গেটের দিকে। আর বিপত্তিটা ঘটল ঠিক তখনই। তাড়াহুড়োর মাথায় গেটের বাইরে বেরুবার মুহূর্তে একটু হলেই পা পিছলে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন আর কি! তবে, প্রাচীরের ওপর দু'হাতের ভার রেখে কোনমতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে উধাও হলেন কোথায় যেন।

—ওঃ, ভারী তো মেজাজ! উঠে দাঁড়িয়ে বললেন নকুড় মামা—আচ্ছা; আমিও দেখাচ্ছি—থানায় গিয়ে এক্ষুণি রিপোর্ট করছি ওর নামে।

—সেই ভালো; বললেন নিমাই বাবু—ভয় যখন দেখিয়েই গেল, আগে ভাগে সত্যেন বাবুকে জানিয়ে রাখা উচিত। চল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। অমিত, তুমি যাবে নাকি?

—যাব বলছ? আচ্ছা, চল; কতকটা যেন অনিচ্ছা সহকারেই উঠে দাঁড়ালেন অমিত সেনগুপ্ত।

গেটের দিকে এগুলেন সকলে।



ওরা চলে যাবার পর বারান্দায় এল নিতাই। কিন্তু···ও কি! রান্নাঘরের দরজা দিয়ে অমন করে উঁকি দিচ্ছে কেন রামলাল? তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল নিতাই। নকুড় মামা ওরা যে পথে গেলেন সেদিকেই বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে রইল রামলাল, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল তারপর। ব্যাপারটার অবশ্য মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। অমন করে উঁকি দিয়ে কি-ই বা দেখছিল রামলাল, আর কেনই বা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল হঠাৎ?

—কিরে নিতে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বিশুর প্রশ্নে ঘাড় ফেরালো নিতাই; বলল—এমনি;

পল্টু আর মলয় এল তারপর।

—বুঝলি, নিত্যলাল বাবু কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষেপেছেন আমাদের ওপর; বলল মলয়—একা একা আর বাইরে বেরুব না বরং, কি বলিস?

একটি অক্ষরও কানে গেল না নিতাই-এর। ওর সন্ধানী চোখ দু'টো তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেছে গেট সংলগ্ন একফালি ঘাস জমিটুকুর দিকে। একটুকরো সাদা কাগজ ওখানে পড়ে আছে না! কোন চিঠি নয় তো! পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নিতাই। সত্যি, চার ভাঁজে ভাঁজ করা ছোট্ট একটুকরো কাগজই পড়ে আছে। হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে চোখের ওপর কাগজটা মেলে ধরল নিতাই। হতাশ হতে হল এবার। ভেবেছিল শত্রুপক্ষের কোন মারাত্মক চিঠিটিঠি হবে। তেমন তো নয়ই, বরং লাইন তিনেকের

অদ্ভুত এক কবিতা লেখা আছে কাগজে। এক নিঃশ্বাসে কয়েকবার পড়ে নিল নিতাই।

লেখা আছে—

আরো জলে—রাখ তলে ;
আম টকে –টাস,
দশ লট নেব তাস।

ভুরু কোঁচকালো নিতাই। এমন কবিতা কোন বই-এ পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু অর্থ কি কবিতাটার ? প্রথম লাইনটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে। জলের আরো তলায় রাখতে বলেছে। কিন্তু কে বলেছে ? আর, রাখবেই বা কি ? হয়তো আম হতে পারে। কারণ পরের লাইনেই আছে "আম টকে"। তাহলে বোঝা গেল—আম টকে যাচ্ছে বলে জলের তলাতে রাখতে বলেছে। এ পর্যন্ত ভাববার পর খুঁৎখুঁৎ করল নিতাই। ঠিক যেন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না কথাটা। আম টকে গেলে পরে কেউ কি জলের তলাতে রেখে দেয় ? কে জানে ! ভাবনার মোড় ঘোরালো সে। নিশ্চয়ই কারোর পকেট থেকে পড়েছে চিঠিটা। কিন্তু কার পকেট থেকে ? নকুড় মামা ? অমিত সেনগুপ্ত ? ··এ পর্যন্ত ভাবতেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মত কথাটা মাথায় চলে এল হঠাৎ। হ্যাঁ বোঝা গেছে এইবার। কাগজটা পড়েছে নিত্যলাল বাবুরই পকেট থেকে। কারণ বেরুবার সময় গেটের এখানটায় পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। তা ছাড়া···

—ওটা কিসের কাগজরে নিতে ? বিশুর প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেল নিতাই। এগিয়ে দিল কাগজটা।

হাতে নিয়ে জোরে চেঁচিয়ে পড়ল বিশু।

—এ আবার কেমন কবিতা ? হেসে বলল মলয়—জীবনেও শুনি নি।

—শেষের কথাটা অবশ্য আমি বুঝেছি ; বলল বিশু—দশ লট

তাস নেবে বলেছে। মনে হয় সারাদিন বসে বসে বোধ হয় তাস খেলবে কেউ।

—বাদ দে ও-কথা ; বলল নিতাই—শোন্ পল্টু, নকুড় মামার হাতে একটা আতস কাচ দেখেছিলাম না সেদিন ?

—ড্রয়ারে আছে ; সোৎসাহে বলল পল্টু—নিয়ে আসব ?

—নিয়ে আয় ; পরীক্ষা করতে হবে কাগজটা। আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।

নিমেষের মধ্যে বড় ধরনের গোলমত একটা ভারী আতস কাচ এনে নিতাই-এর হাতে দিল পল্টু। গম্ভীর মুখে বারান্দার একধারে এসে উবু হয়ে বসল নিতাই। তারপর কাগজটা মেঝেতে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল আতস কাচের ভেতর দিয়ে। আর এক রাশ উৎকণ্ঠা মাখা চাউনি মেলে ধরে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল পল্টু বিশু আর মলয়। বেশ খানিকক্ষণ কাচটা এদিক-ওদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করবার পর হতাশ হল নিতাই। না, আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য একটা দাগও দেখা যাচ্ছে না কাগজটাতে। অক্ষরগুলোই কেবল নজরে আসছে বড় বড় হরফ হয়ে।

—পেলি ? আগ্রহভরে বলল বিশু।

—জানতাম পাওয়া যাবে না ; আতস কাঁচটা পল্টুর হাতে দিয়ে "চণ্ডালের নিঃশ্বাস" বই-এর যুতসই একটা লাইন মনে মনে ভেবে নিয়ে বলল নিতাই—হত্যাকারী চতুর ; সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লিখবার সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার করেছে সে।

—তাহলে কি করবি এখন ? বুঝবি কি করে ? বলল মলয়।

—ভাবতে হবে অনেকক্ষণ ; তাহলে যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

—আচ্ছা, তুই তাহলে খুঁজে বের কর, আমরা ততক্ষণে ঘুরে আসি ?

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো নিতাই।

হৈ হৈ করতে করতে রাস্তায় নামলো ওরা।



ওরা চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যেই বাইরে বেরুলো নিতাই। লাইন তিনেকের কবিতাটার কথা মনে পড়ল আবার! আশ্চর্য! কি এর অর্থ? আর, কেনই বা লিখেছে এমন এক বিদঘুটে কবিতা? আজ পর্যন্ত যে ক'খানা ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েছে সে, তার একটিতেও এমন কোন কবিতার উল্লেখ নেই। তবে চিঠি অনেক গোয়েন্দাই কুড়িয়ে পেয়েছে, কিন্তু এমন বিশ্রী এক কবিতা লেখা ছিল না তার কোনটিতেই। বড্ড বিরক্ত বোধ করল নিতাই। কবিতাই যদি লিখতে হয় তো বাড়ি বসে লিখলেই তো ঝামেলা মেটে; খুনী হবার দরকার কি?

আসল প্রশ্ন হল, সত্যি সত্যিই কি এই কবিতার সঙ্গে সুবলবাবুর হত্যাকারীর কোন সম্পর্ক আছে? না কি অযথাই সাত পাঁচ ভেবে চলেছে সে? কে জানে। শীতের হালকা নরম রোদ্দুর মাখা ফাঁকা পথ বেয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটবার পর বাঁ দিকে মোড় নিল নিতাই। এ পথেরই একেবারে শেষ প্রান্তে আছে বিশাল সব দৈত্যের মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালাতে ভর্তি গভীর জঙ্গল। যেখানে কিনা প্রতিটি পদক্ষেপেই আছে রাশি রাশি অজানা বিপদের হাতছানি। সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে সাহস পায় না—এমনি হল জঙ্গলের গভীরতা। তবুও জঙ্গলের পথ ধরল নিতাই।

বর্তমান অভিযানের গোয়েন্দা হল সে; আর গোয়েন্দাদের তো সহ্যই করতে হয় অনেক কিছু।



বিকালের দিকে নিজেই এলেন সত্যেনবাবু। বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছিলেন নকুড় মামা, হরিদাস চন্দ, নিমাই রায় আর নির্মল সোম।

—ভালোই হল; অনেকে আছেন দেখছি; বলতে বলতে বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসলেন সত্যেনবাবু।

—আছি তো বটেই; বললেন হরিদাসবাবু—কিন্তু আপনার কাজ এগুলো কদ্দুর? কেবল তো আসছেন আর যাচ্ছেন; খুনীর পাত্তা কোথায় মশাই?

—সময় হলেই পাবেন; অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

—আপনার আর কি মশাই? ভুরু কুঁচকে নির্মল সোম বললেন।

—যত ঝামেলা তো আমাদেরই।

—সত্যি, এক্কেবারে হোপ্‌লেস অবস্থা! ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালেন নিমাইবাবু—এমন ভাবে থাকা যায়? খাওয়া ঘুম মাথায় উঠেছে আমাদের!

—যাক ও কথা; কাজের কথায় আসা যাক এবার। সিগারেট ধরিয়ে সত্যেনবাবু বললেন—ওয়েল হরিদাসবাবু, আপনার সেই কোটটা খুঁজে পেয়েছেন কি?

—হুঁ, তা পেয়েছি; অরূপের বাগানে কে যেন ফেলে গিয়েছিলো; অরূপই অবশ্য দিয়ে যায় আমাকে।

—অদ্ভুত ব্যাপার তো! বললেন নির্মলবাবু—তোমার কোটটাই বা বারবার হারায় কি করে? ঠিক করে রাখতে পার না?

—বলি রাখব কোথায় শুনি? আমার মাথায়? চড়া গলায় হরিদাসবাবু বললেন—দেখনি আমার ঘরটার দশা? বিছানা থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত গিজগিজ করছে ঐ একটা ঘরের মধ্যে। হুঁঃ।

—তা বটে। ততক্ষণে মাথা নেড়ে নকুড় মামা বললেন—আচ্ছা, ঐ যে পলাশ নামে ছোক্‌রা চাকরটা আছে, ওর কাজ নয় তো? খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে বেশ খানিকটা হাসলেন হরিদাসবাবু। বললেন—কি যে বল; নাক টিপলে দুধ বেরোয়; সে নাকি করবে এত বড় কাজ! হাসালে। তা ছাড়া……

—আচ্ছা নকুড় বাবু, আপনার ঐ ধাঁধুনেটিকে একবার ডাকুন দেখি? কথার মাঝেই বললেন সত্যেনবাবু।

এতটা সময় ধরে দরজার গায়ে কান রেখে নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল নিতাইরা। এবারে সামান্য নড়েচড়ে দাঁড়ালো নিতাই। ডানদিকের ভুরুটা সামান্য উঁচু করে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে অল্প একটু হেসে ফিসফিসিয়ে বলল—কিরে, বলেছিলাম না যে রামলালই হল এক নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি? দেখলি তো এবার? ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল বাকি তিনজনে।

ইতিমধ্যে রামলাল এসে পড়েছিল। সত্যেনবাবুকে দেখেই কাঁপতে লাগলো ঠক্‌ঠক্ করে। কাঁদো কাঁদো গলাতে বলল—দারোগা হুজুর, গিরেফতার করবেন নি মোরে—এই রামজীর নাম স্মরণে নিয়া কইতেছি…

—আহ্—চোপ্! ধমকে বললেন সত্যেনবাবু। ভালো চাও তো ঠিক ঠিক জবাব দাও আমার প্রশ্নের। নইলে কিন্তু থানায় নিয়ে আটকে রাখব।

—জয় রামজী, এডা কইলেনডা কী…আমি জানেন না কিছু…একটুকুও জানেন না……

—ব্যাস্-চুপ! শোন, কাল রাতে চোরের মত চুপি চুপি কোথায় গিয়েছিলে তুমি, বল তো?

—না তো বাবু···আমি তো ঘুইমে ছিলেন সেইক্ষণে··· ; কোন মতে সাফাই গাইলো রামলাল—জয় রামজী কইতেছি······

—মিথ্যে বোলো না রামলাল; তোমার সব ব্যাপার জানা আছে আমার। শুনবে কোথায় গিয়েছিলে? সেই নেশা করবার ওষুধ আনতে গিয়েছিলে তুমি। বল, ঠিক কি-না?

—সে কি! আর্তস্বরে চেঁচালেন নকুড় মামা; আর বিস্ফারিত চোখে বললেন হরিদাসবাবু—এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! রামলালও নেশা করত নাকি!

পরিস্থিতির আকস্মিকতায় যেন বোবা হয়ে পড়েছিল রামলাল। লাল লাল চোখ দুটো মেলে ধরে কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে।

বললেন সত্যেনবাবু—হ্যাঁ, নেশার কবলে পড়েছিল রামলালও। ও জিনিস শেষ হলে জোগাড় করতেই হবে যে করে হোক। কাজেই রাতের বেলা অমন চুপিসারে বেরুতে হয়েছিলো ওকে। কই রামলাল, বল—চুপ করে আছ কেন?

—দারোগা হুজুর···আমি···জয় রামজী, কি কইব···কিচ্ছু জানেন না···বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল রামলাল। একটু সময় তাকিয়ে দেখলেন নকুড় মামা; তারপর এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে গর্জে উঠলেন স্থান কাল ভুলে—হতচ্ছাড়া উল্লুক ইয়াঙ্কি গুণ্ডা কোথাকার! আমার বাড়িতে বসে নেশা করা! দাঁড়া···আজই বিদায় করছি তোকে।

—উঃ, এ যে ভাবাই যায় না! মন্তব্য করলেন নিমাইবাবু।

—ভাবতে পারেন না এমন অনেক কিছুই জানতে বাকি আছে এখনও, মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন সত্যেনবাবু। তারপর গেটের ওধারে

দাঁড়ানো জীপ লক্ষ্য করে হেঁটে যেতে যেতে বললেন—সময় হলেই জানতে পারবেন সব কিছু।

—যাক্, আমিও চলি তাহলে। সাতটা বেজে গেল। বিরাট এক হাই তুলে নির্মলবাবু বললেন—মুনমুনটার আবার পরীক্ষা কাল থেকে।

—চল, আমিও বেরুব ভাবছি। অরূপের বাড়ি হয়ে আসব একবার। উঠলেন নকুড় মামাও।

সকলে চলে গেলে বাইরে এলো নিতাই আর বিশু।

—কিন্তু, রামলালটা কোথায় গেল রে? তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল নিতাই—একটু আগে তো এখানেই ছিল।

—তাই তো; ভুরু কুঁচকে বিশু বলল—রান্নাঘরেও তো নেই। দরজা তো খোলা।

—হুঁ, নিশ্চয়ই পালিয়েছে ব্যাটা।

—পালিয়েছে? কোথায়?

—কোথায় কে জানে, তবে আমি জানতাম যে ও পালাবে। ইস্, হাতের মুঠোতে পেয়েও কেন যে ওকে ছেড়ে দিল দারোগাটা!

—তার মানে···তার মানে···সুবলবাবুকে ও-ই খুন করেছে! বলছিস কি তুই!

—ঠিকই বলছি; একেবারে প্রথম থেকেই খুনী বলে সন্দেহ করেছিলাম ওকে···

—তাহলে গ্রেপ্তার করলি না কেন? দারোগাটাকেও তো বলে দিতে পারতিস?

—হুঁ পারতাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নিতাই—কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

—তাহলে? কি করবি এখন? আর কি ধরতে পারবি ওকে? বই-এর ডিটেকটিভদের মত বাঁ দিকে ঠোঁটটা সামান্য উঁচু

করে হাসলো নিতাই। তারপর 'শকুনের কান্না' বই-এর লাইন তুলে বলল—প্রকৃত অপরাধীকে চেষ্টা করে ধরতে হয় না, নিজে থেকেই এগিয়ে এসে ধরা দেয় সে। যাক ও কথা, এখন শোন্, খুব চুপি চুপি একটা কথা বলব তোকে, কেউ যেন জানতে না পারে।

বড় বড় চোখে তাকালো বিশু।

—শোন্ বলছি ; এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল নিতাই—খুনীটাকে ধরতে হলে ঠিক আটটার মধ্যে জঙ্গলের সেই লালবাড়িটাতে যেতে হবে আমাদের।

—কে বলল তোকে ? জানলি কি করে ?

—পরে সে সব কথা বলব ; এখন সাড়ে সাতটা বাজে ; যাবি কি-না বল।

ফ্যালফ্যাল করে একটু সময় তাকিয়ে রইল বিশু ; পরে বলল—যেতে তো চাই ; কিন্তু, খুনীটা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, ঠেকাব কি করে ? বন্দুক টন্দুক নেই তো আমাদের।

—বন্দুক লাগবে না ; আমরা তো আর মারপিট করতে যাচ্ছি না ; ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকব কেবল। তারপর চাঁদের আলোতে খুনীটাকে একবার চিনতে পারলেই ওর নামটা গিয়ে বলে দেব সত্যেনবাবুকে।

নিতাই-এর কথাটা যেন তবুও মনঃপূত হল না বিশুর ; বলল—কিন্তু···মানে···নকুড় মামা যদি জানতে পারে ? তবে ?

ধ্-ত্তোর ; বিরক্তিপূর্ণ গলায় বলল নিতাই—ভেবেছিলাম তোর বোধ হয় সাহস আছে। এখন দেখছি একেবারে যাচ্ছেতাই।

শেষের কথাটা আত্মসম্মানে লাগল বিশুর। যাকে বলে রীতিমত পালোয়ানী চেহারা ওর। অথচ সেই ওকেই নাকি 'যাচ্ছেতাই' বলে গালিগালাজ করছে নিতাই-এর মত লিকপিকে চেহারার একটা সামান্য ছেলে ! অসম্ভব ; সহ্য করা চলে না কিছুতেই। এদিক ভেবেই চড়া গলাতে পাল্টা জবাব দিল সে—চুপ কর, চুপ

কর ; তোর চেয়ে হাজারোগুণ সাহসী আমি, বুঝলি ? বেশি বকবক করিস নে, যাবি তো চল।

—চল তবে ; শোন্, আগে পা টিপে টিপে গেটের ওদিকে চলে যা তুই ; খবরদার—কেউ যেন টের না পায়। আমি পরে আসছি।

ঘাড় নেড়ে শিকারী বেড়ালের মত হালকা পায়ে গেটের দিকে হেঁটে গেল বিশু। ওকে যেতে দেখেই দু'পা সরে এসে দরজার ফুঁকো দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিল নিতাই। লুডো খেলাতে মশগুল পল্টু আর মলয়। অন্য কোন দিকেই লক্ষ্য নেই ওদের। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়েই বিশুর পিছু নিল সে।



বেশ খানিকক্ষণ হাঁটবার পর জঙ্গলের মোটামুটি গভীরে এল দু'জনে। এখানে আছে কেবল গাছ আর গাছ। সঙ্গে জমাট অন্ধকার। এলোমেলো সব দমকা বাতাসের দাপটে হা হা শব্দে মাতামাতি করছে অজানা অচেনা গাছের ডালাপালাগুলো। তবুও রক্ষে, চাঁদের আলো আছে আজ, তাই অতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে না জঙ্গলটাকে। ঘেউ ঘেউ শব্দে একদল কুকুর ডাকাডাকি করছে কোথায় যেন ; সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে ডাক। এ ছাড়া অবশ্য আর কোন শব্দ নেই কোথাও। একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ—থমথমে। যেন কোন এক আশঙ্কাপূর্ণ মুহূর্তের জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান অন্ধকারাচ্ছন্ন নাম-না জানা লম্বা লম্বা গাছগুলো।

—ঐ ছ্যাখ, বিশু, লালবাড়িটার একেবারে কাছে এসে গেছি। প্রবল ঠাণ্ডার দাপটে কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে বলল নিতাই।

দ্রুত ঘাড় উঁচু করে তাকালো বিশু। হ্যাঁ—একেবারেই কাছে এসে পৌঁছেছে ওরা। সম্মুখস্থ গাছ গাছালির ঘন আবরণ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করা বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলোর ছোপ গায়ে মেখে একটু তফাতেই জমাট আঁধারের দোসর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটা।

—এদিকে আয় বিশু ; সংলগ্ন একটা ঝোপকে ইঙ্গিত করে বলল নিতাই—ওটার ভেতর লুকোব আমরা।

—কিন্তু খুনীটা আসবে কোন্ পথে ?

—সেটা পরে ভাবব ; আগে আয় তো।

খুব সন্তর্পণে ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো দু'জনে। জায়গাটা ঠিকই খুঁজে বের করেছে নিতাই। এখান থেকে একেবারে পরিষ্কারভাবে নজরে রাখা যাবে বাড়িটাকে। তবে ঝোপ বলেই একটু যা অস্বস্তি। ছড়ানো ছিটানো সব ডালাপালার উপদ্রব ছাড়াও রয়েছে রাশি রাশি মশার নির্মম অত্যাচার। তবুও অপলক চোখে বাড়ি সংলগ্ন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে। এক মিনিট···দু'মিনিট···বেশ খানিকটা সময় বয়ে গেল এমন করে। খুনীর চিহ্নই নেই কোথাও। চাঁদের আলোমাখা শীতল পথটুকু কেবল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে একই ভাবে। হঠাৎ গালে চাপড় দিয়ে মশা মারলো বিশু !

—উঃ কি মশা ! আর কতক্ষণ থাকবি রে ?

—দাঁড়া না একটু। ফ্যাসফ্যাসে গলাতে ধমক দিল নিতাই।

—ঠাণ্ডা লাগছে বেজায় ; চল-বরং······

—চুপ্ ! ঐ ছ্যাখ,—কথার মাঝেই চাপা গলায় বলল নিতাই। তাকালো বিশু। বিপরীত দিক থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসছে এদিকেই। চাঁদের স্বচ্ছ আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল যে

লম্বা ঢ্যাঙা চেহারা লোকটার। পরণে গরম কোট আর প্যাণ্ট। গেটের কাছাকাছি পায়ে পায়ে হেঁটে এসে হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়ালো লোকটা। তারপর বাড়িটা লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললো একবার—দু'বার—তিনবার। ব্যাস্, মুহূর্ত্তেই ঘটে গেল অভাবনীয় এক ঘটনা। জঙ্গলের ভয়াবহ সেই শীতল নিস্তব্ধতাটুকু ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে খুব কাছ থেকেই যেন হঠাৎ এক পাল শেয়াল চেঁচিয়ে উঠল ক্যা-হুয়া ক্যা-হুয়া শব্দে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল বিশুর। উহ্, এত কাছেই ছিল তাহলে শেয়াল-গুলো! ভাগ্যিস, ওদের দেখে নি ততক্ষণ! হাড় মাংস তুলে নিত তবে কামড়ের চোটে। ভয় অবশ্য পেয়েছিল নিতাইও। অমানুষিক এক ভীতিকর শিহরণে যেন বরফ হয়ে উঠেছিল গোটা দেহটা। কিন্তু তবুও দাঁত মুখ চেপে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সে। কয়েক মুহূর্ত এমন ভাবে পার হবার পর ঠিক উল্টো দিকের মানুষ সমান উঁচু গাছপালাগুলো যেন নড়ে উঠল হঠাৎ। আর তারপরই পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল বীভৎস চেহারার এক অমানুষিক মুণ্ড। কিন্তু···কিন্তু ও কার মুখ! কোন জন্তু না রাক্ষসের! বড় বড় দাঁতগুলো হিংস্রভাবে বেরিয়ে আছে ঠোঁটের বাইরে—আর দু'কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে টকটকে কাঁচা রক্ত। গোলগোল চোখ দু'টোর চাউনি স্থির বরফশীতল।

—নি···নিচে রাক্ষসটা! কাঁপা গলাতে কোনমতে বলল বিশু। জবাবে কিছুই বলল না নিতাই। অবশ্য উপায়ও ছিল না বলবার মত। 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত বেরুতে চাইছে না মুখ থেকে—গলা-টলা সব শুকিয়ে কাঠ। মলয়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বলেছিল মলয়, রামনাম জপলে নাকি কাছে ঘেঁষতে পারবে না রাক্ষসটা। অতএব দেহের সবটা শক্তি একত্রিত করে কোন মতে অস্ফুট স্বরে রামনাম জপবার প্রচেষ্টা চালালো সে। আর ঠিক তখনই অমানুষিক সেই মুণ্ডটার ওদিক থেকে ভেসে এল গমগমে এক

রক্তজল করা কণ্ঠস্বর। কোট প্যাণ্ট পরা সেই ঢ্যাঙা লোকটাকে উদ্দেশ করেই বলছে যেন—

—তোমাকে এখানে কেন আসতে বলা হয়েছে, আন্দাজ করেছ কিছু? একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালো লোকটা। বলল তারপর—না, কিছুই আন্দাজ করি নি।

আশ্চর্য! সেই নাঁকি নাঁকি স্বর! ঠিক ওরকমই লম্বা ঢ্যাঙা! কে ঐ লোকটা? নিত্যলালবাবু! প্রবল এক উত্তেজনার ভারে থরথর করে কেঁপে উঠল নিতাই।

—নিতে, গলার স্বরটা যেন নিত্যলালবাবুর বলেই মনে হচ্ছে! ফিসফিস করল বিশু।

—ঠিক বলেছিস, তবে···, বাকি কথাগুলো শেষ করবার আগেই শোনা গেল বীভৎস এক অট্টহাসি। হা-হা-হা। শীতল অন্ধকার মাখা গোটা জঙ্গলটাতেই কাঁপন জাগিয়ে বিকট ভাবে হাসছে অমানুষিক সেই মুণ্ডটা। বেশ খানিকক্ষণ এক নাগাড়ে হাসবার পর শোনা গেল সেই ভীতিকর কণ্ঠস্বর—শোন নিত্যলাল, এটা কী অস্বীকার করতে পার যে পুলিশ তোমাকেই সন্দেহ করছে?

এতক্ষণে নিশ্চিত হল বিশু; ঐ কোট প্যাণ্ট পরা লোকটাই তবে নিত্যলাল বাবু। কিন্তু···তাহলে রাক্ষসের মাথাওলা লোকটা কে? কি করতে এসেছে আবার? সেদিনের মত খুন করবে নাকি? বলছিলেন নিত্যলাল বাবু—হ্যাঁ জানি, পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করছে।

—এজন্য দায়ী কিন্তু তুমিই।

—আমি? না, মোটেই না।

—শোন, এখন আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। গমগমে গলা শোনা গেল—এমন দু'দুটো কাজ তুমি করেছ, যাতে করে খুব সহজেই তোমাকে সন্দেহ করতে পেরেছে পুলিশ। প্রথম, কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে টর্চের একটা ব্যাটারি তোমার বারান্দায় পড়ে যায়

তোমারই হাত থেকে। ব্যাটারি যে আমাদের ব্যবসার কতবড় এক প্রয়োজনীয় সূত্র—একথা তোমার অজানা নয়। তবুও এমন ঘটনা ঘটে গেল। এ পর্যন্ত বলতেই প্রায় আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিত্যলাল বাবু—না, বিলিভ মী, আমি ব্যাটারি ফেলি নি। এমন কি অসতর্ক কোন মুহূর্তে পড়েও নি আমার হাত থেকে।

—তবে কি অযথাই কথাগুলো বলে চলেছে পুলিশ?

—কি জানি, বলতে পারব না।

—যাক্, এবারে শোন তোমার দু'নম্বর কাজের কথা। আর, এইটিই হল তোমাকে সন্দেহ করবার পক্ষে সবচাইতে বড় প্রমাণ। সুবল বাবু যেদিন নিহত হলেন, জঙ্গলের ভেতর কেন এসেছিলে তুমি? আর, এসেছিলেই বা কার হুকুমে? বল, স্পীক—জবাব দাও—।

পাথরের মূর্তির মত একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিত্যলাল বাবু। পরে বললেন—মিথ্যে, শতভাগ মিথ্যে এ কথা। আমি যাইনি; একটিবারের জন্যও জঙ্গলের দিকে যাইনি সেদিন।

—যাও নি, তাই না? হা হা শব্দে শোনা গেল একটু আগেকার মত সেই অট্টহাসি। পরমুহূর্তেই ভেসে এল সেই গমগমে কণ্ঠস্বর—গিয়েছিলে নিত্যলাল বাবু, গিয়েছিলে তুমি। ঐ এক ফোঁটা ছেলেগুলো কি আর পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলবে? সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই তুমি হবে পুলিশের চোখে সন্দেহজনক ব্যক্তি। আর এরপর যদি ওরা গ্রেপ্তার করে বসে একবার, তবে তো জেরার চোটে এমন সব কথা ফাঁস করে দিতে বাধ্য হবে তুমি—যা নাকি দলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ফলস্বরূপ আমার পরিচয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে পুলিশের কাছে। বুঝতে পারছ আশা করি?

—আমি জানি না, কিছু জানি না; ভগবানের নাম নিয়ে বলছি কিছু করিনি আমি।

—যাক্ সে কথা ; শোন, পুলিশের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক, এ আমি চাই না। অথচ, আজ যদি তোমাকে ছেড়ে দিই, তো কালই হোক, কি পরশুই হোক—নিশ্চিত ভাবে ধরা পড়বে তুমি। আর তাহলেই মুখ খুলতে বাধ্য হবে। কাজেই, বুঝতে পারছ, সুবল বাবুর মত তোমার মুখখানাও চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোন পথই খোলা নেই আমার কাছে। অর্থাৎ, মৃত্যুই হল তোমার একমাত্র পাওনা।

কথাটা কানে যেতেই থরথর করে কেঁপে উঠল নিতাই। তাহলে এই রাক্ষসের মাথাওলা লোকটাই যে সুবল বাবুর হত্যাকারী! অথচ, ঠিক এই মুহূর্তে দুঃখও হচ্ছে নিত্যলাল বাবুর জন্য—ইস্! আর একটু পরেই নৃশংস ভাবে মারা পড়বেন তিনিও। কিন্তু এতসব জেনেই বা এখানে এলেন কেন তিনি? তা ছাড়া, ঐ লোকটাই বা কে? বোঝা যাচ্ছে নিত্যলাল বাবুও চেনেন না তাকে। কারণ, চিনলে নিশ্চয়ই একটিবারের জন্যও তার নাম উল্লেখ করতেন এতক্ষণে। তা ছাড়া···, ভাবনায় ছেদ পড়ল। কানে এল নিত্যলাল বাবুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর—না না, আমি মরব না কিছুতেই ; বাঁচতে চাই আমি···ওহ্ ভগবান! প্রত্যুত্তরে শোনা গেল চড়া সুরের গর্জন—মরতে তোমাকে হবেই নিত্যলাল বাবু। মনে রেখ, আমাকে মারবার একমাত্র প্রমাণ হল তুমি। আর, সেই তোমাকেই জ্যান্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে তুলে দেব—এতটা নির্বোধ আমি অন্ততঃ নই।

—কিন্তু···কিন্তু···শেষ পর্যন্ত তাহলে হত্যাই করবে আমাকে! কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন নিত্যলাল বাবু—এতটুকুও হাত কাঁপবে না তোমার?

জঙ্গল কাঁপানো সেই বিকট অট্টহাসি সহযোগে ভেসে এল প্রত্যুত্তর—সুবল বাবুকে হত্যা করবার সময় হাত যখন কাঁপে নি, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার নিত্যলাল বাবু—তোমার বেলাতেও

ব্যতিক্রম হবে না এতটুকু। নাও, মরবার জন্য প্রস্তুত হও এখন। এক—দুই—

"তিন" বলবার আগেই ঘটে গেল অচিন্তনীয় এক অভাবনীয় ঘটনা। এ—কি !! চোখের ওপর গোটা জঙ্গলটাকেই দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখলেও বোধহয় এতটা বিস্মিত হত না নিতাই আর বিশু। কল্পনাই করা যায় না যে এতবড় একখানা চমক অপেক্ষায় ছিল শেষ দৃশ্যের জন্য। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দু'জনে। হ্যাঁ, 'তিন' বলবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বিপরীত প্রান্ত থেকে ভেসে এল এক বজ্র কঠিন হুঙ্কার—তার আগে তুমি নিজেই মরবার জন্য প্রস্তুত হও দলনেতা। তোমার সব খেলা এখন শেষ।

কথা শেষ করেই পাশের ঝোপ থেকে উদ্যত রিভলভার হাতে বেরিয়ে এল তৃতীয় এক ছায়ামূর্তি।

আকস্মিক এই ঘটনায় হয়তো হতভম্ব হয়ে পড়েছিল রাক্ষসের মাথাওলা লোকটাও ; গমগমে গলায় বলল—এ-কি ! তুমি ! রিভলভার পেলে কোত্থেকে।

হো হো করে হেসে উঠল তৃতীয় সেই ছায়ামূর্তি। বলল—এতদিন ধরে আমাকে কেবল পাগল বলেই জেনেছে সকলে। প্রকৃতপক্ষে ওটা ছিল আমার ছদ্মবেশ। ডিটেকটিভ মৃন্ময় ব্যানার্জীর নাম বোধহয় অজানা নেই তোমার।

কথাটা কানে যেতেই ছট্‌ফট্ করে উঠল বিশু। মৃন্ময় ব্যানার্জীর নাম ও জানে। খবরের কাগজে লোকটার ছবিও দেখেছে কয়েকবার। অথচ, জঙ্গলের সেই পাগলটাই কি-না··· ; এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! নিতাই-এর হাতে আলতো চিমটি কেটে ফিসফিস করল বিশু—শুনেছিস, ঐ পাগলটাই নাকি ডিটেকটিভ মৃন্ময় ব্যানার্জী।

—জানি আমি, চুপ কর এখন। গভীর গলায় বলল নিতাই।

মৃন্ময় ব্যানার্জীর কথাতে যেন হঠাৎ থমকে গেল রাক্ষসের

মাথাওলা লোকটা। চুপ করে রইল একটু সময়, পরক্ষণেই বলল—বেশ, ধরা দেব আমি। রিভলভার নামাও তোমার।

—ওটা যেমন আছে তেমনই থাকবে; পাথরের মত শক্ত গলাতে বললেন মৃন্ময় ব্যানার্জী—খুব বেশি খাতির কিন্তু করব না তোমাকে। মনে রেখ গোটা জঙ্গলটাই পুলিশ এখন ঘিরে রেখেছে। এখনও ধরা দাও বলছি, নইলে কিন্তু গুলি খেয়ে মরতে হবে কুকুরের মত।

—বেশ, ধরাই দিচ্ছি তাহলে।

একটু সময় চলে গেল তারপর। কোন সাড়াশব্দই নেই কোনদিকে। অস্বস্তিকর এক কবরের নিস্তব্ধতায় যেন ঝিমঝিম করছে চারদিক। ডালপালার খচ্‌মচ্‌ শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। পরমুহূর্তেই ঠিক বিপরীত দিকের ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। কিন্তু, কই? রাক্ষসের মত তেমন মাথাওলা নয় তো! চাঁদের আলোতে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মাঝারী উচ্চতার দোহারি চেহারা। ফুল প্যান্ট আর ওভারকোট পরা। মাথার ফেল্ট হ্যাটটা নীচের দিকে এমন ভাবে টেনে দিয়েছে যে মুখটাই দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল লোকটা।

—হ্যাণ্ডস্ আপ মাই ব্রাদার; মাথার ওপর হাত তুলে এস। মৃন্ময় ব্যানার্জীর কঠিন কণ্ঠস্বরে অবশ্য থমকে দাঁড়ালো এক মুহূর্তের জন্য; তারপর হাত দুটো তুলে দিল মাথার ওপর।

উদ্যত রিভলভার হাতে খানিকটা এগিয়ে গেলেন মৃন্ময় ব্যানার্জী। বললেন—সুবল বাবুকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল তোমাকে। চোরা চালানকারী দলের নেতা হিসাবেও অভিযুক্ত তুমি। এ ছাড়াও···বাকিটা আর বলা হল না।

ওভারকোটধারী বুটপরা পায়ের এক বিশ মনি লাথিতে তার আগেই মৃন্ময় ব্যানার্জীর হাতের রিভলবারটা গিয়ে ছিটকে পড়ল সংলগ্ন গভীর জঙ্গলে। হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

আর হো হো শব্দে বিকট ভাবে হেসে উঠে বিপরীত দিকে ছুটতে ছুটতে বলল ওভারকোটধারী—টা টা মিঃ টিকটিকি ; চলি এবার, কেমন ?

এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে পড়লেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন মৃন্ময় ব্যানার্জী। পরক্ষণেই তীরের বেগে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলেন ওভারকোটধারীকে। শুরু হল ধস্তাধস্তি। একবার এ ওকে প্রচণ্ড মারের চোটে কোণঠাসা করছে তো ও পরমুহূর্তেই একে আবার বেদম পেটাচ্ছে মাটিতে ফেলে। শেষ পর্যন্ত জিতল অবশ্য ওভারকোটধারীই। বিরাশি সিক্কার মোক্ষম এক ঘুসি সামলাতে না পেরে কাঁটাঝোপের ওপর হুড়মুড় করে ছিটকে পড়েই নট-নড়নচড়ন হয়ে রইলেন মৃন্ময় ব্যানার্জ্জী। বারেকের জন্য ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুট লাগাল ওভারকোটধারী।

প্রমাদ গুণল নিতাই। আর রক্ষে নেই। এদিকেই ছুটে আসছে লোকটা, আর, একবার যদি কোনমতে দেখে ফেলে ওদেরকে, ছাতু করে ফেলবে ঘুষির চোটে। আড় চোখে তবুও বিশুর দিকে একবার চেয়ে দেখল সে। কেমন যেন অদ্ভুত এক ভিন্ন চাউনি বিশুর চোখে। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেই গতি পরিবর্তন করে—অন্য দিকে পালাতে চাইছিল ওভারকোটধারী ; কিন্তু অকল্পনীয় এক ঘটনা ঘটে গেল এক নিমেষে। আতঙ্কগ্রস্ত নিতাইকে একেবারে বোবা করে দিয়ে অতর্কিতে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশু। আচমকা এই আক্রমণের জন্য হয়তো একেবারেই প্রস্তুত ছিল না লোকটা। দু'তিন পা পিছু হটে কোনমতে টাল সামলে নেবার আগেই বিশুর ব্যায়াম করা হাতের মোক্ষম এক ঘুষিতে একেবারে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কিন্তু, সে আর কতক্ষণ ! পরমুহূর্তেই যে জিনিসটা হাতে করে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো মাটি ছেড়ে—ঝোপের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও যেন হিম হয়ে গেল

নিতাই। উজ্জ্বল চাঁদের শীতল আলোতে চিক্‌চিক্ করছিল লোকটার হাতে ধরা পাক্কা সাড়ে ছ-ইঞ্চি লম্বা ছুরিখানা।

নীচের ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরে নিজেকে শক্ত করে তুলবার প্রচেষ্টা চালালো নিতাই। না, ভয় পেলে চলবে না। আর ডিটেকটিভদের তো শক্ত হতে হবে পাথরের মত। চরম মুহূর্তেও বুদ্ধি হারানো চলবে না ওদের—পাহাড়ের মত স্থির অঞ্চল অবস্থায় ধরে রাখতে হবে নিজেকে। পরিষ্কার মনে আছে "চণ্ডালের নিঃশ্বাস" বই-এর ডিটেকটিভের কথা। পাঁচ পাঁচজন গুণ্ডার কবল থেকে কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরেই বেঁচে ফিরেছিলো সে। অথচ বর্তমান অভিযানের ডিটেকটিভ হয়েও কি-না ওরই চোখের ওপর শত্রুর আক্রমণে এমন ভাবে প্রাণ হারাবে বিশু! না, কিছুতেই না। যে করে হোক উদ্ধার করতেই হবে ওকে। কিন্তু···কেমন করে? কেমন করে? অতি দ্রুত কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মত বুদ্ধিটা মাথায় খেলে গেল হঠাৎ। হ্যাঁ···উপায় খুঁজে পেয়েছে সে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সুযোগের অপেক্ষায় অপলক চোখে তাকিয়ে রইল নিতাই।

ওদিকে বিশুর অবস্থা আরো শোচনীয়। লোকটার হাতে ধরা ছুরিটা চোখে পড়তেই যেন অসাড় হয়ে এল গোটা দেহটা। নড়াচড়া করবার সামান্যতম ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। প্রবল এক ভীতিকর শিহরণে যেন সমস্ত শরীরটাই কাঁপতে শুরু করেছে ঠক্ ঠক্ করে।

আর হি-হি শব্দে পিলে কাঁপানো হাসি হাসতে হাসতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। তারপর ছুরিসুদ্ধ হাতটা মাথার ওপর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তুলে ধরে গমগমে গলায় বলল—এক ফোঁটা একটা বাচ্চার রক্তে হাত রাঙাবার ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু উপায় নেই। আমার বিরুদ্ধে যাবার একমাত্র শাস্তিই হল মৃত্যু। নাও, বাছাধন—মরবার জন্য তৈরি হও।

সুযোগ সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত মুহূর্ত। ডান হাতের মুঠোতে ধরা শক্ত মাটির ঢেলাটা লোকটার মাথা লক্ষ্য করে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো নিতাই। অব্যর্থ লক্ষ্য। মাথায় গিয়ে লাগলো টিপ করে। ফেল্ট হ্যাট ছিল বলে অবশ্য রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটল না, তবে নিতাই যা চেয়েছিল, তাই হল। অর্থাৎ কি-না, আচমকা এক আঘাতে লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পেছনের দিকে। আর ঠিক ঐ মুহূর্তটুকুরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল বিশুও। এক লহমায় নিজেকে সচেতন করে তুলে লোকটাকে দু'হাতে প্রকাণ্ড এক ধাক্কা মারল সে। অতর্কিত আক্রমণ। কাজেই বিন্দুমাত্র টাল সামলাতে পারল না লোকটা। বিশ্রীভাবে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আর হাতের ছুরিটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দশ হাত তফাতে। তবুও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে ; কিন্তু পারলো না। মৃন্ময় ব্যানার্জী এসে পড়েছেন এর মধ্যে। ক্ষিপ্র হাতে ওভারকোটধারীকে বেঁধে ফেললেন তিনি।

অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে দেখে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল নিতাই। ওকে দেখেই মৃদু হেসে বললেন মৃন্ময় বাবু—এই যে মি. ডিটেকটিভ, এই হল সুবল বাবুর হত্যাকারী। তোমার সাহায্য ছাড়া ধরা যেত না কিছুতেই।

অবাক চোখে ওভারকোটধারীর দিকে তাকিয়ে রইল নিতাই। গল্পের বই-এ হত্যাকারীর কথা বহুবার পড়েছে সে। কিন্তু চোখের ওপর জলজ্যান্ত একটা খুনী দেখা এই প্রথম। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে লোকটা। তবে চেনা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। ফেল্ট হ্যাটটা এমনভাবে বাঁকা হয়ে রয়েছে যে মুখটাই দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

—চিনতে পারছ একে ? মৃন্ময় ব্যানার্জীর প্রশ্নে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো নিতাই। বলল—না, টুপীটার জন্য মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। অল্প একটু হাসলেন মৃন্ময় ব্যানার্জী ; তারপর এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন টুপিটা— ;

—একি! এ যে····· ; হতচকিত নিতাইয়ের বাকি কথাগুলো শেষ হবার আগেই সমর্থন জানিয়ে বললেন মৃন্ময় বাবু—একেবারেই অবিশ্বাস্য কি বল? কথা শেষ করে বার কয়েক হুইসেলে 'ফু' দিলেন তিনি। এবার বিশুর পিঠ চাপড়ে বললেন—সাবাস্ ভাই, সত্যি, প্রশংসা করবার মতই সাহস এবং শক্তি তোমার। যা তুমি দেখালে চিরকাল মনে থাকবে আমার।

হুইসেলের শব্দে দু'জন কন্‌স্টেবল সঙ্গে করে ইতিমধ্যে এসে পড়েছিলেন সত্যেন বাবু। নিতাই আর বিশুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—হত্যাকারী গ্রেপ্তারের সবটুকু কৃতিত্ব কিন্তু এদেরই; কি বলেন মৃন্ময় বাবু?

—ঠিক তাই; ঘাড় নেড়ে মৃন্ময় বাবু বললেন—আমার তো প্রতিটি পদক্ষেপেই নিতাই-এর সাহায্য নিতে হয়েছে। ওয়েল সত্যেন বাবু, কাল সকাল আটটা নাগাদই পুলিশ সুপার দিবাকর বাবু উপস্থিত থাকছেন না?

—হ্যাঁ, বিশেষ একটা কাজে কাল ঐ সময়ে এখানে আসবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি।

—আমার ইচ্ছে, ওঁর উপস্থিতিতেই হত্যাকারীকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তখন···

—বেশ তো; আমি না হয় সকলকে ঐ সময় থানাতেই উপস্থিত থাকবার কথা জানিয়ে দেব। আর নিতাই, তোমাদের চারজনকে আমি নিজে গিয়ে বাড়ি থেকে জীপে করে নিয়ে আসব; কেমন? ঘাড় নাড়লো নিতাই এবং বিশুও।

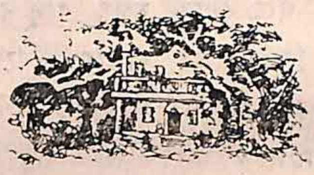
—কিন্তু, খুনী যে···, কি যেন বলতে চাইছিল বিশু; মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললেন মৃন্ময় বাবু—হ্যাঁ, সে কথা কাল আলোচনা করব। আপাতত সে প্রসঙ্গ থাক।

—তবে যাওয়া যাক এখন? এরপর কন্সটেবল শিউরামকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সত্যেন বাবু।

জঙ্গলের বাইরেই অপেক্ষা করছিল কালোরঙের পুলিশ ভ্যানটা। ভেতরে উঁকি দিল নিতাই। এক কোণে মাথা নীচু করে বসে আছেন নিত্যলাল বাবু। হয়তো অনেকটা আগেই পুলিশের লোকেরা গ্রেপ্তার করে এনেছে ওকে।

—চল তোমরা; বললেন সত্যেন বাবু—জীপ দাঁড় করানো আছে ঐ দিকে। আসুন মৃন্ময় বাবু।

বড় বড় পায়ে জীপের দিকে এগুলেন সকলে।



পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই নিতাইদের থানায় পৌঁছে দিলেন সত্যেন বাবু। একতলার একেবারে বাঁ দিকের ঘরটায় সকলের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘরে ঢুকেই অবাক হল নিতাই। কেউ আর বাদ নেই; হাজিরা দিয়েছেন সকলেই। চুপচাপ বসে আছেন যে যাঁর চেয়ারে। চেনাজানা ছাড়াও মোটাসোটা চেহারার অচেনা এক ভদ্রলোককে লক্ষ্য করল নিতাই। লম্বা টেবিলটার ওধারে গদীআঁটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন ভদ্রলোক। সিগারেট পুড়ছে দু'আঙ্গুলের ফাঁকে। ওঁর ঠিক ডান দিকের চেয়ারে আছেন মৃন্ময় বাবু। টেবিলের দু'দিকে বন্দুকধারী দু'জন পুলিশ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত; মাঝে মধ্যে চোখের তারা দু'টো কেবল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বড্ড নিঝুম নিস্তব্ধ ঘরের বাতাস; এতগুলো মানুষ —অথচ 'টু' শব্দটি নেই কারোর মুখে।

একেবারে সামনের সারির চারখানা খালি চেয়ারকে ইঙ্গিত করে সত্যেন বাবু বললেন—তোমরা ওখানে বস। এই বলে মৃন্ময় বাবুর ঠিক পাশের চেয়ারটা দখল করলেন তিনি। কি যেন বললেন নীচুগলায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন মৃন্ময় বাবু। গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন—আপনাদের সকলকেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্ুবল বাবুর হত্যাকারীকে গত রাত্রে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। গত রাতেই অবশ্য জানিয়ে যেওয়া যেত সবকিছু, কিন্তু পুলিশ সুপার দিবাকর মিত্র মশাই বিশেষ কাজে হাসিমারাতে আজই আসছেন জানতে পেরে ওঁর উপস্থিতিতেই সবকিছু বলাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম।

এ পর্যন্ত বলবার পর মোটাসোটা ভদ্রলোকটিকে ইঙ্গিত করে বললেন তিনি—হ্যাঁ, ইনিই পুলিশ সুপার দিবাকর মিত্র।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন ভদ্রলোক। মুখে অবশ্য বললেন না কিছুই।

—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম ; আগের কথার জের টেনে বললেন মৃন্ময় বাবু—একটা কথা স্বীকার করে নিচ্ছি প্রথমেই। আমার ধারণায়, হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশের চাইতেও বেশ কয়েক গুণ বেশি কৃতিত্বের দাবী করতে পারে একেবারে সামনের সারিতে বসা ছেলে চারজন। সত্যি কথা বলতে কি, ওদেরই সক্রিয় সহযোগিতার ফলে এত তাড়াতাড়ি যবনিকা টানতে পেরেছে পুলিশ। ঘাড় ফিরিয়ে নিতাইদের দিকে প্রশংসাপূর্ণ চোখে তাকালেন দিবাকর মিত্র। ভারী গলায় বললেন—তাই নাকি ?

—ঠিক তাই স্যার ; মৃদু হেসে সমর্থন জানালেন সত্যেন বাবু।

—হ্যাঁ, হত্যাকারীর কথাতে আসছি এবার। বলছিলেন মৃন্ময় বাবু—গত কয়েক মাস ধরে এই হাসিমারা অঞ্চলে কোন এক স্মাগলিং দলের কার্যকলাপের কথা মাঝে মধ্যে কানে আসতে থাকে পুলিশের এবং সেই সঙ্গে শুরুও হয় গোপন অনুসন্ধান। কিন্তু

কোন সুফল পাওয়া তো দূরের কথা, বরং অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। পরিস্থিতি যখন এমন, ওপরওলার আদেশে তদন্তকার্যের ভার নিয়ে প্রায় মাস চারেক আগে এখানে এসে পৌঁছলাম আমি। প্রথম নজরেই জঙ্গলের ঐ লালবাড়িটা কেন জানি এক সন্দেহজনক জায়গা বলে ঠেকলো আমার চোখে। ব্যাস্, ভোল পাল্টিয়ে নিলাম দ্রুত। আসল পরিচয় ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে ধরলাম পাগলের ছদ্মবেশ। কিন্তু সুবিধা হল না তাতেও। প্রমাণ কোথায়? এই চোরাচালানকারী দল কোন্ জিনিস কি ভাবে চালান করছে, শত চেষ্টাতেও টের পেলাম না এতটুকু। এ পর্যন্ত বলে থামলেন মৃন্ময় বাবু। টেবিলে রাখা গ্লাসের জল এক চুমুকে খালি করে নিয়ে বললেন—সবকিছুই এরপর একটু একটু করে পরিষ্কার হতে শুরু করল নিতাই নামের ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর। প্রথম আলাপেই বুঝে নিলাম তদন্ত কার্যে এরই মধ্যে আমার চাইতেও বেশি অগ্রসর হয়ে পড়েছে সে। সুতরাং হাতে রাখা দরকার। কাজেই নিজের প্রকৃত পরিচয় ওর কাছে প্রকাশ করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। বলাবাহুল্য, চুক্তি অবশ্য রইল যে এই গোপন সম্পর্কের কথা কোন কারণেই তৃতীয় কারোর কাছে ফাঁস হয়ে পড়বে না। কই নিতাই, হ্যাঁ কি না বল?

থতমত খেয়ে গেল নিতাই। একঘর ভর্তি মানুষের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি যে সে ব্যাপার! তা-ও আবার পুলিশের উপস্থিতিতে। ভালোভাবে শব্দই বেরুতে চাইছে না গলা থেকে। জিভটিব সব শুকিয়ে খটখটে।

—এ্যাই নিতে, তোকে জিজ্ঞাসা করছেন, জবাব দে? ফিসফিসিয়ে বলল পল্টু।

চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়ালো নিতাই। তারপর মৃদু গলায় বলল—হ্যাঁ, জঙ্গলে যেদিন খুন হল, সেদিনই তো কথাগুলো বললেন আমাকে।

—গুড বয় ; বলতে শুরু করলেন মৃন্ময় বাবু—প্রকৃতপক্ষে এই নিতাই-এর কাছ থেকেই প্রথম আমি জানতে পারি যে নিষিদ্ধ সব মাদকদ্রব্য নিয়ে কারবার এই দলটির। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া টর্চের ব্যাটারিটা নিতাই-এর কাছ থেকে পাবার পরই গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। বুঝলাম, টর্চের ব্যাটারির ভেতর কোকেন, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ বস্তু পুরে বাইরে রপ্তানী করে এই দল।

—আই সী! অস্ফুট গলায় বললেন দিবাকর বাবু।

—কেবল এইটুকুই নয় স্যার, মাদক দ্রব্য ছাড়াও সোনা পর্যন্ত চালান করে এই দল। আর তার প্রমাণও মজুত রয়েছে আমার হাতে। যাক একথা, মৃত সুবল বাবুর কথাতে আসছি এবার। বহুগুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এই সুবল বাবু। অন্যসব ব্যবসা ছাড়াও এই চোরাচালানকারী দলের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। টাকাও লুটছিলেন দু'হাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ; শেষ পর্যন্ত ঐ টাকার মধ্য দিয়েই নেমে এল ওঁর মৃত্যুদূত। কোন কারণে হয়তো দলনেতার প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়েছিল সুবল বাবুর কাছে। আর তাকেই ব্ল্যাকমেইলিং-এর হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগাতে গিয়ে শোচনীয় ভাবে নিহত হলেন ভদ্রলোক। সোজা বাংলায় অতিরিক্ত লোভই কাল হয়ে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত।

একটু থামলেন মৃন্ময় বাবু। খক্‌খক্ শব্দে কাশলেন কয়েকবার ; তারপর বললেন—সুবল বাবু যখন খুন হলেন, ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঝোপের আড়ালে ছিল নিতাইরা। কাজেই, দু'দুটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা সহজেই জানা গেল নিতাই-এর মুখ থেকে। প্রথম, খুব কাছ থেকেই না কি শোনা গিয়েছিল একপাল শেয়ালের চিৎকার। আর, দ্বিতীয়, ঝোপের আড়ালে না কি দেখা গিয়েছিল বীভৎস আকৃতির এক মুণ্ড, যার কিনা চোখ দু'টোর দৃষ্টি হল স্থির—অপলক। ঠিক এই দু'টো বিষয়ই কিন্তু আগে জানা গিয়েছিল

মলয়ের মুখ থেকে। জঙ্গলের ঐ লালবাড়ি সংলগ্ন ঝোপের আশপাশ থেকে সে-ও না কি একপাল শেয়ালের চিৎকার শোনার পর দেখতে পেয়েছিল অপলক চোখে চেয়ে থাকা বীভৎস চেহারার এমনই একখানা মাথা। তাই না মলয় ?

—হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম ; উঠে দাঁড়িয়ে মলয় বলল—ঠিক রাক্ষসের মত দেখতে ; বড় বড় দাঁত—ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে ! একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়েছিল !

—বেশ, তাহলে নিতাই আর মলয়—ওদের দু'জনের বর্ণনাতেই পাওয়া যাচ্ছে যে বীভৎস সেই মাথাটার দৃষ্টি হল স্থির—অপলক। এখন, প্রশ্ন হল, মানুষই হোক্ বা রাক্ষসই হোক্, চোখের দৃষ্টি অপলক হবে কেন ? তা ছাড়া, চেহারার বীভৎসতাও লক্ষ্যণীয়। স্বাভাবিক ভাবেই, জিনিসটাকে মুখোস বলে ভেবে নিলাম আমি। বুঝলাম, হয়তো বা নিজের পরিচয়টা গোপন রাখবার উদ্দেশ্যেই এমন এক বিদঘুটে আকারের মুখোস ব্যবহার করেছিল হত্যাকারী।

—ঠিক তাই ; সমর্থন জানিয়ে সত্যেন বাবু বললেন—গত রাতে জঙ্গল থেকে মুখোসটা উদ্ধারও করেছি আমরা।

—বেশ ; শেয়াল ডাকের কথায় আসা যাক এবার। বললেন মৃন্ময় বাবু—নিতাই এবং মলয় দু'জনেই বলেছে যে একপাল শেয়ালের চিৎকারের পরই নাকি আবির্ভাব ঘটেছিল বীভৎস সেই মাথার। এর থেকে এটা আন্দাজ করা খুব কঠিন কি যে শেয়ালডাককে তার আবির্ভাবসূচক সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহার করেছিল হত্যাকারী ?

—রাইট ; ঘাড় নেড়ে দিবাকর বাবু বললেন—অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে হয় নিজে শেয়ালডাক ডাকতে পারে হত্যাকারী, নতুবা এমন কোন শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র ব্যবহার করে সে ; তাই তো ?

—ঠিক তাই স্যার। তদন্তের কাজ এরপর এগিয়ে চলল জোর

কদমে। ব্যাটারির মাধ্যমেই যা কিছু কার্যকলাপ চোরাচালানকারী দলটির। স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যলাল বাবুকে ব্যবহার করতে হল টোপ হিসাবে। কারণ, নিতাই-এর দেওয়া তথ্য থেকে হত্যাকারীর যেটুকু ছায়া তখন পর্যন্ত চোখের ওপর ভেসে উঠেছে, তাতে আমাদের ধারণায় গোটা হাসিমারার মধ্যে নিত্যলাল বাবুই হলেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। ধারণাটা অবশ্য বাজিয়ে নেওয়া হল ছোট্ট একটা পরীক্ষার মাধ্যমে। অর্থাৎ, পুলিশ থেকে মিথ্যে ভাষণ দেওয়া হল যে বিশেষ ধরনের একখানা ব্যাটারি কুড়িয়ে পাওয়া গেছে নিত্যলাল বাবুর বাগান থেকে।

মাঝপথেই মৃদু হেসে বললেন সত্যেন বাবু—প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কোন ব্যাটারিই পাইনি আমরা। কিন্তু, কাজ হল ওতে। হত্যাকারী চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল পুলিশ যদি সত্যিই ব্যাটারি খুঁজে পেয়ে থাকে, তবে অবধারিত ভাবে অনুসন্ধান চালাবে নিত্যলাল বাবুর বাড়ির সর্বত্র। আর তাহলেই ফাঁস হয়ে পড়বে সবকিছু। সুতরাং কি করা যেতে পারে এরপর? বুদ্ধি খাটিয়ে উপায়ও অবশ্য খুঁজে বের করল একটা। গভীর রাতে সবার বাড়িতে একটা করে ব্যাটারি ফেলে এল সে। কারণ এতে করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যাবে নিঃসন্দেহে। সবার বাড়ি থেকেই ব্যাটারি কুড়িয়ে পেলে কাকে ফেলে সন্দেহ করব কাকে?

—হুঁ; মাথা নেড়ে দিবাকর বাবু বললেন—এর থেকে তাহলে বোঝা গেল যে নিত্যলাল বাবুই হলেন এক নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি। নইলে হত্যাকারীই বা ওঁর ওখান থেকে সামান্য একটা ব্যাটারি কুড়িয়ে পাওয়াতে এত টা ঘাবড়ে পড়বে কেন? ভেরি ইণ্টারেস্টিং! এরপর বলুন মৃন্ময় বাবু।

—এতে অবশ্য সুবিধাই হল আমাদের। হত্যাকারীকে আরো খানিকটা ঘাবড়ে দেবার উদ্দেশ্যে তৈরি করতে হল ভিন্ন এক পরিকল্পনা। অর্থাৎ কি-না, সবার উপস্থিতিতে মিথ্যে বলতে হল

নিতাইকে। নিমাইবাবু খুন হবার মুহূর্তে জঙ্গলের আশেপাশে নিত্যলাল বাবুকে দেখা গিয়েছে—আমাদের পরিকল্পনা মত এমন কথা জানিয়ে দিল নিতাই। ব্যাস্, চার হয়ে গেল দুই-এ দুই-এ। হত্যাকারী দিশেহারা হয়ে পড়ল। উপায় না দেখে ভেতরে ভেতরে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করল নিত্যলাল বাবুকে। কারণ, পুলিশ একবার তাঁকে গ্রেপ্তার করলে ফাঁস হয়ে পড়বে সবকিছু। সুতরাং আর অপেক্ষা করা চলে না। ফলস্বরূপ তিনলাইনের একখানা সাঙ্কেতিক কবিতা লেখা কাগজ এসে পৌঁছলো নিত্যলাল বাবুর হাতে। নিতাই, কবিতাটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার ?

নিতাই কোন জবাব দেবার আগেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল বিশু—হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে—

আরো জলে—রাখ তলে,
আম টকে—টাস ;
দশ লট নেব তাস।

—হ্যাঁ ; বললেন মৃন্ময়বাবু—আর এই কবিতাটাই হাতে পাবার পর গতরাতে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। খুব জটিল অবশ্য নয় সাঙ্কেতিক এই লেখা। প্রতিটি শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটি বাদ দিয়ে পড়লেই হল। যেমন, 'আরো' শব্দের 'রো' বাদ দিলে থাকে 'আ' ; তারপর 'জলে' শব্দের 'লে' বাদ দিলে থাকে 'জ' ; তাহলে "আরো জলে" এই দুটি শব্দ থেকে পাই 'আজ' ; এমন ভাবে বাকি শব্দগুলো পড়লে গোটা কবিতাটার অর্থ দাঁড়ায় ; "আজ রাত আটটা ; দলনেতা।" ব্যাস্, এরপর তো অসুবিধের নেই আর কিছু। রাত আটটায় সদলবলে গিয়ে হাজির হলাম যথা স্থানে।

এ পর্যন্ত বলার পর কথা শেষ করে সত্যেনবাবুর দিকে তাকালেন মৃন্ময়বাবু। দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন সত্যেনবাবু ; বললেন—সবদিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে নিজেও নিত্যলালবাবুর সম্পর্কে আমাদের

বক্তব্যগুলো সঠিক ভেবে নিয়েই তার দিক থেকে চরম ভুল করল হত্যাকারী। যাকগে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাদের। আর দেরী করব না। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই হত্যাকারীর সঙ্গে। শিউরাম—এ শিউরাম ; দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁক ছাড়লেন সত্যেনবাবু।

মিনিটখানেকের মধ্যেই সংলগ্ন দরজা দিয়ে হাতকড়া বাঁধা সেই ওভারকোটধারীকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকল শিউরাম।

—ঐ দেখুন আপনারা ; বললেন সত্যেন বাবু—সুবল বাবুর হত্যাকারী। ফেল্ট হ্যাটের জন্য হয়তো এখনো চিনে উঠতে পারছেন না সঠিক ভাবে। ওয়েল, এখনই সরিয়ে দিচ্ছি। বলেই বড় বড় পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় মাথার টুপিটা সরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

—এ কি !!! নির্মল···তুমি ! এতটা সময় চুপ থাকার পর প্রবল বিস্ময়ের চাপে স্থান কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন নকুড় মামা।

—মাই গড ! ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠলেন হরিদাসবাবু ! বললেন—কি আশ্চর্য ! এ যে ভাবতেই পারছি না ! শেষ পর্যন্ত নির্মল ··তুমি-ই কি-না খুনী !

নিমেষের মধ্যে ছোটখাটো এক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়ে গেল ঘরের ভেতরটায়। নির্মল সোমকে হত্যাকারী হিসাবে জানবার পর কেউই যেন আর বসে থাকতে পারছেন না মুখ বন্ধ করে।

—দেখলে তো নিমাই ! চাঁছাছোলা গলায় বললেন অমিতবাবু —প্রথমেই তোমাকে বলেছিলাম না যে ঐ নির্মল হল পাক্কা শয়তান ! হতচ্ছাড়া জংলী। মুখেই কেবল মিষ্টি মিষ্টি কথা।

অরূপ দত্তও কি সব যেন বলতে চাইছিলেন হাত নেড়ে ; বাধা দিয়ে বললেন মৃন্ময়বাবু—প্লীজ, একটু চুপ করুন সকলে। অযথা

গোলমাল করে লাভ নেই। হ্যাঁ, এই নির্মল সোমই হলেন সুবল সাহার হত্যাকারী। চোরা চালানকারী দলের নেতাও বটে। কি সোমবাবু, কিছু বলবার আছে আপনার?

—আমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে একটি কথাও বলব না আমি। খুব স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে থেমে থেমে বললেন নির্মলবাবু।

—শুনলে নকুড়, ছুঁচোটার কথা শুনলে? উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বললেন নিমাইবাবু—উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে না কি একটিও কথা বলবে না ঐ চামচিকেটা।

—বলবে না বললেই হল? চাবুক মেরে বলানো হবে। রাগে গরগর করতে করতে বললেন হরিদাসবাবু।

—আস্তে আস্তে। টেবিল ঠুকে গম্ভীর গলাতে বললেন দিবাকর বাবু দয়া করে উত্তেজিত হবেন না আপনারা। ওয়েল মৃন্ময়বাবু, একটা প্রশ্ন করছি আপনাকে।

—বলুন?

—একটু আগেই বলছিলেন যে নির্মলবাবুকে না কি আগে থেকেই সন্দেহ করছিলেন আপনি। তেমন কোন প্রমাণ পেয়েছিলেন না কি?

—হ্যাঁ, তা পেয়েছিলাম; বলা বাহুল্য, নিতাই-এর মুখ থেকে জানতে পারি গুরুত্বপূর্ণ ছু'ছুটো কথা। নির্মলবাবুর বাড়িতে নকুড় বাবুর কথামত একটা খাতা আনবার সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয় ছু'টো লক্ষ্য করে আমাকে জানায় নিতাই। প্রথম হল, বিভিন্ন পশুপাখির ডাক ডাকতে পারেন নির্মলবাবু। আর দ্বিতীয়, আজ থেকে বছর কয়েক আগেও না কি যাত্রা থিয়েটার দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ভদ্রলোক। বিষয় ছু'টো একটু গভীর ভাবে দেখলেই কিন্তু এ থেকে মনে পড়ে সেই একপাল শেয়ালের চিৎকার এবং ঝোপের আড়ালে থাকা বীভৎস সেই মুখোসের কথা; নয় কি? কারণ, পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে এমন মানুষের

পক্ষে যেমন শেয়াল ডাক ডাকা মোটেই কঠিন নয়, ঠিক তেমনই সহজ তার পক্ষে একখানা মুখোস সংগ্রহ করা, যে নাকি যাত্রা থিয়েটার দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এ ছাড়া এ ধরনের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বদলে পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে কথা বলাও অস্বাভাবিক নয়।

—রাইট ; মৃদুভাবে ঘাড় নাড়লেন দিবাকরবাবু।

—এ ছাড়া হরিদাসবাবুর কোটটা সরিয়ে আরো একটা মারাত্মক ভুল করলেন নির্মলবাবু···

—এ্যাঁ !! মৃন্ময়বাবুর কথা শেষ না হতেই নাঁকি গলাতে চেঁচিয়ে উঠলেন হরিদাসবাবু—আমার কোটটা ঐ আরশোলাটাই চুরি করত নাকি! সে-কি! কিন্তু···কেন ?

—উদ্দেশ্য একটাই ; আপনাকে ফাঁসানো। দৈহিক দিক দিয়ে আপনি এবং নির্মলবাবু মোটামুটি ভাবে একই মাপের। কাজেই, কোট পরা অবস্থায় হঠাৎ তাকে কেউ দেখে ফেললেও স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু মনে পড়বে আপনারই কথা। কারণ, নির্মলবাবু কোন সময়েই কোট ব্যবহার করেন না। অথচ, কোট পরা অবস্থায় অনেকেই দেখেছে আপনাকে।

—দেখেছ নকুড়, কাণ্ডটা দেখেছ! ঘুষি পাকিয়ে বললো হরিদাসবাবু—এ কথা যদি আগে জানতে পারতুম তবে এক ঘুষিতে মুখের ভোল পাল্টিয়ে দিতাম ওটার। শয়তান কোথাকার।

—উল্লুক-বেল্লিক-ছুঁচো! চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন অরূপ দত্ত—কোট চুরি করে আবার কি না ফেলে এসেছে আমারই বাগানে! আমাকেও ফাঁসাবার মতলব! তবে আমিও বাবা অত বোকা নই, ঝটপট থানায় নিয়ে জমা দিয়ে এসেছি।

—ঠিক তাই ; হেসে বললেন মৃন্ময়বাবু—কোটটা আপনার কাছ থেকে পেতেই কিন্তু গোটা বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। তাড়াহুড়োর মাথায় নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা কোটের

পকেট থেকে সরাতে ভুলে গিয়েছিলেন নির্মলবাবু; কাজেই প্যাকেটের ওপরকার ফিঙ্গার প্রিন্ট থেকে ভদ্রলোক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হই আমি। ঠিক আছে সত্যেনবাবু, আমার কাজ তবে শেষ? সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে দিবাকরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন সত্যেনবাবু—স্যার, সব কিছুই তো আপনি শুনলেন; কেস্ তাহলে কোর্টে ওঠাচ্ছি আমরা; এখানকার কাজ তবে আপাতত শেষ?

—জাস্ট এ মিনিট; গম্ভীর গলাতে দিবাকরবাবু বললেন—আমার কিছু বক্তব্য রয়ে গেছে—।

—বলুন স্যার?

—এখানকার যাবতীয় ঘটনাবলী শোনার পর একটা কথা অবশ্য বিনা দ্বিধাতেই স্বীকার করা চলে। কথাটা হল—ঠিক সামনের সারিতে বসা ছেলে চারজনের অদ্ভুত কর্মদক্ষতা। সত্যি, কেবলমাত্র বুদ্ধি আর সাহসকে সঙ্গী করে যেভাবে অগ্রসর হয়েছে ওরা—সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

অল্প একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে নিলেন দিবাকরবাবু। তারপর বললেন—শুধুমাত্র মৌখিক কতগুলো প্রশংসাসূচক কথা বলে গেলেই ওদের এই কর্মদক্ষতার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে বলে আমার মনে হয় না। আর এই দিক ভেবেই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ওদের পুরস্কৃত করতে চাই আমি। শুধু তাই-ই নয়, এদের ছবি সহকারে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে চাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে। ওয়েল সত্যেনবাবু?

—বলুন স্যার?

—সব কিছুর দায়িত্ব কিন্তু আপনার ওপরই রইল?

—সিওর স্যার। এখুনি ব্যবস্থা করছি আমি।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

নিতাই ওদের সঙ্গে আরো এক প্রস্থ কথাবার্তা চালাবার পর

বিদায় নিলেন দিবাকরবাবু। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একগাল হাসি সহযোগে ছুটে এসে ওদের চারজনকে একসঙ্গে বুকে টেনে নিলেন নকুড় মামা। আনন্দঘন গলায় বললেন—ওরে, আজ তোরা এতবড় কাজ করেছিস দেখে গর্বে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। তোদের —তোদের আমি আর কি বলব!

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বললেন হরিদাসবাবু—ছেলেগুলো বিচ্ছু হলে কি হবে, পেটে যে এত বুদ্ধি ধরে কে জানতো। চল্, আমার বাড়িতে আজ তোদের সব্বার নেমতন্ন। ওখানেই খাবি তোরা—

হৈ চৈ করে সমর্থন জানালেন বাকি সকলে।
